বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে
এম.ফিল (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
নন্দদুলাল মন্ডল
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রূপ কুমার বর্মন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৯

Certified that the thesis entitled "*বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন*" , submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Masters of Philosophy [Arts] in the Department of History of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is NO plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award any other degree/diploma of the same institution where the work is carried out, or to any other institution.

Name: Nandodulal Mandal
Class Roll No: 001700603016
Exam Roll No: MPHS194016
Registration No: 142328 of 2017-18

On the basis of academic merit and satisfying all criteria as declared above, the dissertation work of Mr.Nandodulal Mandal entitled "*বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন*", is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Masters of Philosophy [Arts] in the Department of History of Jadavpur University.

Head Department of History Jadavpur University Kolkata-700032	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

RAC Report on the M.Phil Pre-submission viva of Mr. Nandodulal Mandal

Mr. Nandodulal Mandal, M.Phil student [2017-2019] made his pre-submission seminar presentation on 02.05.2019 at 2.30 pm in the Department of History, Jadavpur University on his M.Phil dissertation provisionally entitled "**বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন**" before the Research Advisory Committee consisting of Dr.Chandrani Banerjee Mukherjee [expert] and Prof. Rup Kumar Barman [supervisor].

The presentation was satisfactory and he candidate may be permitted to submit his dissertation.

Dr. Rup Kumar Barman
Head & Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata-700032

Dr. Chandrani Banerjee Mukherjee
Assistant Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata-700032

DECLARATION

I do hereby declare that the dissertation titled *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন* submitted by me in order to fulfill partial requirement for the degree of M.Phil in History at Jadavpur University of the session 2017-2019. My class Roll No. 001700603016 and Exam Roll No. MPHS194016.

This work is original and no part of it has been submitted anywhere else for any other Degree or Diploma.

Date Nandodulal Mandal

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ এক বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ যার বিস্তৃতি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি পর্যন্ত। এখানে নানা ভাষার সংমিশ্রনের সাথে সাথে নানা জাতির মানুষের আগমন হয়েছে যুগে যুগে। ভারতবর্ষ এই সমস্ত জনজাতিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং বন্দোবস্ত করেছে বাসস্থানের নিশ্চয়তা। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের মাটিতে বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের নামে বিভাজিত হয়েছে; তেমনি এই ভারতের মাটিতে সমগ্র মানব জাতি কল্যাণ সর্বসমন্বয়ের কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল এগুলি ছিল তারই নিদর্শন। এই সমস্ত প্রতিবাদী ধর্মের মধ্যে সর্বস্তরের মানুষের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম যে স্থান অধিকার করেছিল তা অবিস্মরণীয়। বৌদ্ধ ধর্ম একদিকে যেমন সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের ধর্মে পরিণত হয়েছিল তাদের আশা আকাঙ্খা মান্যতা দিয়ে। তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল তাঁর উচ্চ মানবতাবাদী আদর্শের জন্য। সমগ্র বিশ্বকল্যানো এর জন্য এই ধর্ম শুধু ভারতে নয় এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আমাদের বঙ্গভূমিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। অর্থাৎ খুব দ্রুত বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান বৌদ্ধগয়া, যে মগধকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার তার পাশেই অবস্থিত বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধধর্ম ছোড়িয়ে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গের সমতটি, হরিকেল, রারহ, সুহ্ম, পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদ গুলিতে যে গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল তা বিভিন্ন উৎস থেকেই বোঝা যায়। গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটলেও পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলার প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকে হীনযানীদের প্রভাব থাকলেও ধীরে ধীরে মহাযানী সম্প্রদায় বাংলায় সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। মন্ত্র তন্ত্র থেকে শুরু করে গুপ্ত সাধনা সবই চলতে থাকে। বাংলার পাল বংশের অবসান ও সেনদের আগমন, বৌদ্ধদের একেবারে কোনঠাসা করে দেয়। নতুন করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আমদানি ঘটে বাংলায়। বাংলায় মুসলিম শাসনকালে বৌদ্ধরা আরো অবলুপ্তির পথে চলে যায়।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ইংরেজদের ক্ষমতা দখল, অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেও বৌদ্ধরাও অংশগ্রহণ করে। সংখ্যাগত দিক থেকে বৌদ্ধরা কম হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যেমন বাংলার বৌদ্ধদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। তেমনি আবার মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনেও বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সক্রিয় দেখা যায়। এছাড়াও নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী থেকে নোউ বিদ্রোহ সবক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষদের কথা সেভাবে চিহ্নিত হয় নি। এমনকি এদেরকে নিয়ে সার্বিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-গবেষক মহলে দীর্ঘকালীন নীরবতা দেখা যায়। এই নীরবতাই আমাকে এই গবেষণা কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

মূলত কয়েকটি প্রশ্নকে সামনে রেখে এই সন্দর্ভের অবয়ব নির্মাণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ক্রমবির্বতনে কিভাবে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্থান ও বিকাশ হয়েছিল? দেশবিভাগ তথা বঙ্গভঙ্গের রাজনীতিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিল? বাংলা বিভাজন কিভাবে বাংলার বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিকও সাংস্কৃতিক জীবনে রেখাপাত করেছিল? স্বাধীনতা–পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিভাবে নিজেদের অভিযোজিত করার প্রয়াস

করে চলেছেন?--এই সমস্ত বিষয়গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই সন্দর্ভে।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হল। আমার এই গবেষণাপত্রটির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহায়তাদানের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তাঁর সুনিশ্চিত মতামত ব্যতীত গবেষণা পত্রটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল-কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা লেখ্যাগার, কলকাতা; এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষ ধন্যবাদ জানাই শিলিগুড়ির মীরা বড়ুয়া, মালবাজারের এস.কে চাকমা ও কলকাতার ললিতা বড়ুয়াকে যাঁরা মূল্যবান মতামত দিয়ে আমার গবেষণা কার্যে সহায়তা করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী (মুখার্জী) ড. মহুয়া সরকার, ড. শুভাশিষ বিশ্বাস, ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. মেরুনা মুর্মু, ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রী সমির দাস সর্বাদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদেরকে আমি প্রণাম জানাই।

গবেষণাকার্য চলাকালীন যারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তারা হলেন ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার, অরিজিৎ হালদার, আনিসুল হক, প্রসেনজিৎ নস্কর, রাখোহরি বাগ, কৌশিক সরকার, পরিতোষ বর্মন। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়া আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধু-বান্ধবদের আমার ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণা প্রকল্প নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের দ্বারা পরিচালিত SVMCS (Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship) এর আর্থিক সাহায্য আমার গবেষণার বিশেষ সহায়তা দান করেছে।

সবিশেষ প্রণাম জানাই আমার পিতা নবদ্বীপ মন্ডল ও মাতা দুলালি মন্ডল ও দিদি লাবনী মন্ডল যাঁরা আমার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস, যাঁদের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ।

নন্দদুলাল মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
যাদবপুর, কলকাতা
৭০০০৩২।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i-iv
ভূমিকা	১-১২
প্রথম অধ্যায়: বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়-বিবর্তন ও বৌদ্ধ জনবিন্যাস	১৩-২৫
❖ বাংলার ভৌগলিক সীমা	
❖ প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ ➢ পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন ➢ সমতট ➢ হরিকেল ➢ তাম্রলিপ্ত ➢ বঙ্গ ➢ বঙ্গাল	
❖ বৌদ্ধ জনবিন্যাস	
❖ পর্যবেক্ষণ	
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ	
দ্বিতীয় অধ্যায়: বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্থান - বিকাশ	২৬-৫৪
❖ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের পটভূমি	
❖ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিকাশ	
❖ বাংলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন	
❖ বৌদ্ধ সম্মেলন ও বিভাজন	
❖ বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিকতা	
❖ মন্ত্রযান ও বজ্রযান	
❖ পর্যবেক্ষণ	
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ	

তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্গবিভাগ রাজনীতি ও জাতীয় সংগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়	৫৫-৬৭
❖ বঙ্গ বিভাগ ও রাজনীতি	
❖ বঙ্গ বিভাগ: সামাজিক প্রভাব	
❖ জাতীয় সংগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়	
❖ পর্যবেক্ষণ	
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ	
চতুর্থ অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৬৮-৯১
❖ পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের অভিগমন	
❖ বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিবর্তন	
❖ উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান	
❖ দক্ষিণবঙ্গে বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান	
❖ নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব	
❖ পর্যবেক্ষণ	
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ	
উপসংহার	৯২-৯৪
সংযোজনী	৯৫-৯৮
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	৯৯-১০৫

ভূমিকা

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে বিদ্যমান সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি-অর্থনীতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে লাভ করে নতুন রূপ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। দেশে-সমাজে সম্প্রদায়ে দেখা দেয় সৃষ্টিশীলতায় মনশীলতায় প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। প্রতিটা শাসকগোষ্ঠী তাদের স্ব স্ব চিন্তা চেতনা-সংস্কৃতি ও শাসন পদ্ধতির আলোকে রাষ্ট্র পরিভচালনা করেন। তাদের শাসন কার্যক্রম দেশের সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে তেমনি অনেকক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে। আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে সাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা অসহযোগিতা কালের পরিক্রমায় ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়। পরবর্তী প্রজন্ম তথা ইতিহাসবিদ-গবেষক দ্বারা অতীতের শাসক গোষ্ঠী সুকীর্তির জন্য হন প্রশংসিত, কুকীর্তির জন্য হন নিন্দিত। ভারতবর্ষের অবিভক্ত অংশ ঐতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন শাসক দ্বারা সাসিত হয়েছে। তারা এতদ্অঞ্চলের অর্থনীতি-রাজনীতির পাসাপাশি সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল উপাদান বৌদ্ধ সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক দ্বারা কখনো সমৃদ্ধি লাভ করেছে, প্রসারিত হয়েছে, কখগ্নো পরিবর্তিত হয়েছে, কখনো পতিত হয়েছে আবার কখনো পুনঃজাগরিত হয়েছে; যা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের এক ক্রান্তিকালীন সময়ে এক সামন্ত রাজার সন্তান সিদ্ধার্থ গৌতম কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে। তখন সমাজে বিরাজ করছিল অনৈতিক-অমানবিক আচার-আচরণ, হানা-হানি, হিংসা-বিদ্বেষ, গোঁড়ামি-কুসংস্কার-অস্পৃশ্যতা, অন্যায়-অসাম্য আর জাতিভেদ-বর্ণভেদজনিত শোষণ-নির্যাতন। তার বিপরীতে ঐতিহাসিক মহানব্যক্তিত্ব মানবপুত্র বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধ, সর্বজীবের প্রতি অহিংসা ও ভালবাসা প্রদর্শন, সর্বমানবের কল্যানসাধন, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা, সততা-সাম্য-মৈত্রী-করুণার চর্চা এবং চারিত্রিক শুদ্ধ থাকার উপদেশ শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে এক নতুন মানব সভ্যতার

গোড়াপত্তন ঘটায়। বৌদ্ধধর্মের চতুরার্যসত্য, আর্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ, অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ, প্রতীত্যসমুৎবাদ তত্ত্ব ভারতীয় সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অনেক বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত-চিন্তক বৌদ্ধধর্মকে ধর্মের যেয়ে, বেশী একটা সমাজ-বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দুঃখ-নিরোধের মাধ্যমে সুখ-শান্তি-স্বস্তি বৃদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং বংশপরম্পরা চর্চিত হচ্ছে বলে বা গুরুর নির্দেশ বলে গ্রহণ না করে যুক্তি-ন্যায়সংগত বিচারে গ্রহণযোগ্য হলেই কোন কিছুকে গ্রহণ করার, নতুবা ত্যাগ করার উপদেশ বুদ্ধকে বিশ্বের প্রথম আধুনিক ও বিপ্লবী মানুষে পরিণোত করেছে। বুদ্ধের মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদ ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে করেছে মহৎ ও উঁচু আদর্শ সম্পন্ন, বুদ্ধের জীবন, জীবনাদর্শ ও বৌদ্ধ ধর্মের সারাৎসার নিয়ে গঠিত বৌদ্ধ সংস্কৃতি জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মহীয়ান করেছে, মানুষের আত্মশক্তির গুরুত্ব গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষু-সংঘ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং সংহতিশক্তির মূর্ত প্রতীক।

ভারতের বৃহৎ বাংলা সহ সর্বত্র এবং বহির্বিশ্বেও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ঘটে। চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, মায়ানমার, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, লাক্ষা, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোক (খ্রি. পূ. ২৭৩-২১২) সহ আরো অনেক বৌদ্ধ শাসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মোটামুটি পাল রাজত্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম তার উৎকর্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেন আমলে এই ধর্মের প্রভাব জনমানসে ক্ষীন হতে থাকে। মধ্যযুগে ইসলামের আগমনে এই ধর্ম আরো কোনঠাসা হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসকদের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকে এই ধর্ম জনমানসে পুনরায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ এর দেশভাগ সেই প্রবাহে অনেকাংশে ভাটা আনে। বৌদ্ধদের জীবনে নেমে আসে দিনযাপনের সংকট।

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিকাশ লাভ করছিল। এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজধর্মের স্বীকৃতি

লাভ করার সাথে সাথে এই ধর্ম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধর্মের প্রভাব ক্ষীন হয়ে হয়ে আসে এবং স্বাধীনতার পর এই ধর্ম সংখ্যালঘু ধর্মের মর্যাদা পায়। বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) এই ধর্মীয় লঘুত্বকে আরো প্রকট করে তোলে। কাজেই বলা যায় একদা 'রাজধর্ম' হিসেবে স্বীকৃত বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ তার প্রভাব হারিয়ে বাংলায় 'সংখ্যা লঘু' ধর্মে পরিণত হয়েছিল। এই সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে তাই বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সেই অবস্থানগত বিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণার সন্দর্ভটি উপনিবেশিক বাংলা অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার অন্য জনগোষ্ঠীর মত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষরা বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুব অল্প পরিমাণে বসবাস করত। এদের মূল জনঘনত্ব ছিল পার্বত্য চিটাগাং অঞ্চলটিতে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ তথা বাংলা বিভাগ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপর তীব্র আঘাত নিয়ে আসে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের দৃশ্যমান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষরা বাংলা বিভাজনের করাল গ্রাস তাদের নিজের বাড়ি থেকে কিভাবে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তু স্বরূপ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন প্রান্তে এসেছিলেন। ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকোন

ত্রিপিটকসহ বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সাহিত্য পালি, সংস্কৃত, তিব্বতি, চীনা ও মঙ্গোলীয় ইত্যাদি নানা ভাষায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যগুলোর সাহায্য নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম ইতিহাস রচনা করেন অর্থাৎ প্রথম তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বুনুর্ফ।[১] তাঁর গ্রন্থ 'Introductional Historic du Bouddhisme Indien' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ সালে। তারপর থেকে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলার

উপর আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণা করেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকে করেছেন ত্রিপিটক অন্তর্গত মূল গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, অনেকে করেছেন সম্পাদনা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স।[২] পরবর্তীকালে তাঁর পথ অনুসরণ করে অনেকে এই চর্চায় এগিয়ে আসেন, যেমন-Sir James Prinsep, Alexander Cunningham, F. Max Muller, Prof. Vincent Fausboll, Herman Oldenberg, Prof. H. Kern, Prof. Rhys Davids, Mrs. C.A.F. Rhys David, Sir Edwin Arnold, Cosma de Koros, R.C. Childers, Sylvain Levi, Prof. Louis de la Vallee Poussin, Stcherbatsky প্রমুখ[৩]।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আধুনিক পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন চর্চা, বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পণ্ডিত সমাজকে প্রভাবান্বিত করে, অনুপ্রাণিত করে। যার ফলে বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ উপলব্ধি করেন ভারতের গৌরবোজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির শেকড় হচ্ছে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সমাজ সংস্কৃতি। এ নবজাগরণের সময় বাঙালি বৌদ্ধিক সমাজ গৌতম বুদ্ধকে নতুন করে জানতে, আবিষ্কার করতে মনোনিবেশ করেন। আবিষ্কৃত হতে থাকে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, শিল্পকলা, পুরাতাত্ত্বিক স্থান-নিদর্শন, বৌদ্ধ বিহার, মন্দির স্তুপের ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি ইত্যাদি। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে রচিত হতে থাকে বিভিন্ন গ্রন্থ। গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শুরু হয় নতুন করে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের চর্চা, পঠন-পাঠন ও বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও বৌদ্ধ সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য উদ্ধার ও গ্রন্থ রচনায় কলকাতা কেন্দ্রিক যাঁদের অবদানকে গুরুত্ব দিতে হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), সাধু অঘোরনাথ (১৮৪১-৮১), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫১-১৯৩৬), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৮-১৯৩৫), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), কৃষ্ণ বিহারী সেন (১৮৪৭-১৮৯৫), বেনীমাধব বড়ুয়া

(১৮৮৮-১৯৪৮), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০), চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখরা। এঁরা এঁদের রচনাবলীর[৪] মধ্য দিয়ে বুদ্ধের মাহাত্ম, আদর্শের জয়গান করেছেন।

বাঙালি তাত্ত্বিকদের মতো চট্টগ্রামের বৌদ্ধ লেখক সাহিত্যিকরাও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), শ্রীমৎ অগগ্‌সার মহাস্থবির (১৮৬৩-১৯৪৪), পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৮৯৬), কবি সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮), ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক সমন পুণ্ণানন্দ স্বামী (১৮৭০-১৯৩০) ও শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির (১৮৯০-১৯৪৩) প্রমুখরা। এই সমস্ত সাহিত্যিকরা মূলত তাঁদের রচনাবলীর[৫] মাধ্যমে বড়ুয়া বৌদ্ধদের ইতিহাস, বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি, বুদ্ধভজনা, গাথা সংগ্রহ, পালিসংগ্রহ, বুদ্ধকীর্তন ও বৌদ্ধগান রচনা করেছেন। অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখেননি।

সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকে[৬] বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে চর্চা করলেও বাংলায় তাদের ক্রমবিবর্তনের ধারা নিয়ে তেমন কোন বক্তব্য রাখেন নি। তবে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু সংক্রান্ত চর্চার ধারা লক্ষ করা যায়। মূলত সরকারি উদ্যোগ ও প্রয়োজনেই উদ্বাস্তু সংক্রান্ত চর্চা শুরু হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা কলকাতা ও মফঃস্বলে কত সংখ্যায় ছিল তা জানার তাগিদে এই চর্চা শুরু হয়। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়দান ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু তথ্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব 'কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট'কে দিয়েছিল। তাই ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট থেকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছিল। এর উপর নির্ভর করে কান্তি বি. পাকরাসি. ১৯৭১ সালে "The uprooted : A Sociological Study on the Refugee of West Bengal"[৭] গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ, পুনর্বাসন, পরিবার ও সামাজিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে 'এনথ্রোপলজিকাল

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। *'Report on the Sample Survey for Estimating the Socio-Economic Characteristics of Displaced Person Migrated from East Pakistan to State of West Bengal'*[৮] নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যাম্পের বাইরে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের উপর একটি সমীক্ষা চালায়। হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায় *'উদ্বাস্তু'* গ্রন্থটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের আধিকারিক হওয়ায় হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়ের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা ছিল। তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও তাঁদের চাহিদা সম্পর্কে উদ্বাস্তু গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর *'প্রান্তিক মানব'*[৯]ও এবিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জয়া চ্যাটার্জীর *'The Spoils of Partition : Bangala and India'* (1996)[১০] গ্রন্থটিতে দেশভাগের শিকার হওয়া অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে ।

সতীশ কানিতকারের 'Refugee Problems in South Asia'(2000)[১১] উদ্বাস্তু বিষয়ক মূল্যবান একটি গ্রন্থ। এখানে দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে উদ্বাস্তুরা ভারতে তাদের আশ্রয়স্থল গড়ে তুলছে, সে বিষয়ক বর্ণনা এখানে আছে। একইসাথে নেপাল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তবে আলাদাভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উদ্বাস্তু বিষয়ক কোন বক্তব্য এই গ্রন্থে নেই।

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা গুপ্তা এবং শিপ্রা মুখার্জী সম্পাদিত *Calcutta Mosaic* (2009)[১২] গ্রন্থটিতে কলকাতা অভিবাসিত নাগরিকদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ সন্নিবেশিত আছে। বিশেষত জিউস, আর্মেনিয়ান, চীনা সম্প্রদায় এমনকি কলকাতাতে আগত অন্যান্য অবাঙালিদের নিয়ে বিরাট আলোচনার পরিসর রয়েছে। পুস্তকটিতে মূলত ভারতবর্ষে আগত অভিবাসিত মানুষদের নিয়ে আলোচনা আছে। তবে এখানেও অভিবাসিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে তেমন কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না।

মনিকা মণ্ডল তাঁর '*Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal*' (2011)[১৩] গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জেলাভিত্তিক বিবরণ, তাদের সমস্যা, সাহিত্যে ও চলচিত্রে তাদের উপস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন। তবে এই রচনায় উদ্বাস্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে তিনি কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন নি।

অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মন তাঁর '*Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal'* (2012)[১৪] গ্রন্থে ছয়টি অধ্যায়ে দেশভাগের ইতিহাসচর্চা, ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জাতি, ভারত তথা বাংলা ভাগের প্রেক্ষিতে তপশিলি জাতিদের অবস্থান ও বাংলা ভাগের ফলে তাঁদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ড. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া 'বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়' (২০১৭)[১৫] গ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিকাশ, হর্যঙ্ক বংশ থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিবর্তন ও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তাঁদের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলাবিভাজন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অবস্থা বিষয়ক কোন বক্তব্য তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে গৌতম বুদ্ধ ও বুদ্ধ দর্শন নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে রচনার প্রাচুর্য থাকলেও বাংলায় তাদের বিবর্তন নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। আবার বাংলা বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে প্রচুর চর্চা হলেও পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উদ্বাস্তু বিষয়ক গবেষণা অপ্রতুল। কাজেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন' নিয়ে চর্চার বিষয়টি মৌলিক ভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে, যা বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হল- 'বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তনের ধারা' এই বিষয়টিকে আধুনিক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করা। ফলে এই সন্দর্ভটির মধ্য দিয়ে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উত্থান, বিকাশ, বৌদ্ধদের জনবিন্যাস ও পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ সর্বসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে।

গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

বর্তমান সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

১. ঐতিহাসিক ক্রমবির্বতনে কিভাবে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্থান ও বিকাশ হয়েছিল?

২. দেশবিভাগ তথা বঙ্গভঙ্গের রাজনীতিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিল?

৩. বাংলা বিভাজন কিভাবে বাংলার বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিকও সাংস্কৃতিক জীবনে রেখাপাত করেছিল?

৪. পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংস্কৃতিগত দিক থেকে কিভাবে নিজেদের অভিযোজিত করার প্রয়াস করে চলেছেন?

গবেষণার উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রাথমিক এবং মুখ্য উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও বাংলা বিভাজন সম্পর্কিত মুখ্য গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন গেজেটিয়ার তথ্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ, এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্র, জার্নাল থেকে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে মুখ্য উপাদান হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে আহৃত তথ্য। এর সাথে সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা সন্দর্ভ, ও বৈদুতিন মাধ্যম (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট) থেকে

সংগৃহীত তথ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণাসন্দর্ভ নির্মাণে মুখ্য ও গৌণ দুই ধরণের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভ সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন প্রথম পর্যায়ে – তথ্য সংগ্রহ, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যগার, গ্রন্থাগার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে- সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার করা এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া।

গবেষণার মূল উপাদানগুলি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার, এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বা সংবাদপত্রের লেখকের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান সন্দর্ভটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি ও জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাতে সনাতনী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের/ বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে বর্তমানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনংখ্যার পরিসংখ্যানও এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের রাজনীতিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সন্দর্ভের **তৃতীয় অধ্যায়ে।** এখানে বঙ্গভঙ্গের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** লিপিবদ্ধ হয়েছে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব কিভাবে বাংলার তথা পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়েছিল, সে বিষয়ক আলোচনা। সবশেষে উপসংহারে বাংলার বৌদ্ধদের সার্বিক ইতিহাস তথা গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Eugene Burnuf: Introductional Historic du Bouddhisme Indien, (Paris, Maisonneuve, Et Libraires Editures, 1876).

২. উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬—১৭৯৪) একজন ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক। তিনি ছিলেন অ্যাংলো-ওয়েলশ ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি, হেনরি টমাস কোলব্রুক এবং নাথানিয়েল হ্যালহেড-এর সঙ্গে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩. P.V.Bapat (ed): 2500 Years of Buddhism, Seventh Reprint, (Government of India, Publication Division, 2009), পৃ.পৃ. ৩১৯-৩৩০।

৪. শিমুল বড়ুয়া: বৃটিশ শাসিত বাংলায় বৌদ্ধ সমাজের নবজাগরণ, *ধম্মচক্কং,* (নিউ দিল্লী, বুদ্ধ ত্রি-রত্ন মিশন, ২০১২), পৃ.পৃ. ৮৮-৮৯।

৫. *তদেব*, পৃ. ৯০।

৬. Gail Omvedt: Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste, (Delhi, Sage Publications, 2003).

৭. Kanti B.Prakash: *The Uprooted: A Sociological Study on the Refugee of West Bengal*, (Calcutta, Editions Indian, 1971).

৮. *Report on the Sample Survey for Estimating the Socio-Economic Characteristics of Displaced Person Migrated from East Pakistan to State of West Bengal'*

৯. প্রফুল্ল চক্রবর্তী: *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭)।

১০. Joya Chatterjee: *The Spoils of Partition: Bangala and India,* (Cambridge University Press, 2009).

১১. Satish Kanitkar: *Refugee Problems in South Asia*, (Delhi, Rajat Publications, 2000)

১২. Himadri Banerjee (et.al): *Calcutta Mosaic*: Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta, **(**Anthem South Asian Studies, Anthem Press, 2009**)**

১৩. Monika Mondal: *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal*, (Delhi, Monohar, 2011).

১৪. Rup Kumar Barman**:** *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal,* (New Delhi, Abhijeet Publications, 2012).

১৫. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া: *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭)।

প্রথম অধ্যায়

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়-বিবর্তন ও বৌদ্ধ জনবিন্যাস

'বঙ্গভূমি'[১] বলতে যে বিশাল ভূ-ভাগকে এবং তার সঙ্গে তার ওপর অবস্থিত যে ভূপ্রাকৃত পরিবেশ তথা এক বিশাল সমাজ সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়েছে আজ তার রাজনৈতিক কাঁটাতারে বহুধাবিভক্ত। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভাজন আরও দৃঢ় হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বলতে বোঝায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। অন্যদিকে আবার অবিভক্ত বাংলার কিছু অংশ আবার ভারতের মধ্যে রয়েছে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ। এই বিভাজনের বীজ বপন হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ভাষা ভিত্তিক আন্দোলন থেকে 'মুক্তিযুদ্ধ' মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১সালে। ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগ এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান বিভাজন এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ, বাংলার গৌরবউজ্জল ইতিহাস কিন্তু এখান থেকেই শুরু নয়। এর শেকড় বহু প্রাচীন এবং অনেক গভীরে প্রেথিত আছে। কিন্তু সেই শেকড় আবধি পৌঁছতে গেলে আমাদের পিছনে ফিরে দেখতে হবে এবং তাকে অনুধাবন করতে গেলে বাংলার মাটিকে তথা ভূপ্রকৃতিকে সর্বাগ্রে বুঝনিতে হবে। কারণ ভূ-প্রকৃতি হল রঙ্গমঞ্চ এবং তার ওপর উপস্থাপিত নাটক অর্থাৎ মানুষের ক্রিয়া-কলাপ হচ্ছে ইতিহাস। ভূ-প্রকৃতি যে মানব প্রকৃতি তথা মানাব সমাজ সংস্কৃতির ওপর কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে তা ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব। বাংলার মত শস্য-শ্যামলা নদী বিধৌত অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতির আদলেই খুব স্নেহময়ী এবং শান্তি প্রিয়। অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক এবং মধ্যপ্রাচ্যের রুক্ষ ভূপ্রকৃতি সেসব স্থানের মানুষদের করে তুলেছে দূরর্ধস। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বর্বর-যাযাবর আর্য জাতির আক্রমণে এবং মধ্যযুগে মধপ্রাচ্যের বিভিন্ন্য দূরধর্স জাতির আক্রমণ তার উদাহরণ। অন্যদিকে ভারতবর্ষ তথা

বাংলার ভূ-প্রকৃতি তার কোমল স্নেহ সকল কে আশ্রয় দিয়েছে। সুতরাং বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বাংলার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং ভূ-ভাগ বুঝে নেওয়া দরকার।

বাংলার ভৌগলিক সীমা

প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় সীমার নির্ধারণের মূল একক ছিল ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সীমা প্রধানত নির্মিত হত ভূপ্রকৃতিগত সীমা দ্বারা এবং তা সাধারণত অপরিবর্তনীয়। প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিক সীমা যেমন নদনদী, পাহাড়-পর্বত , সমুদ্র ইত্যাদি রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করে এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রীয় সীমা প্রকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করে চলেছে যা বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানপ্রযুক্তির দান। এছাড়া এক-জনত্ব দ্বারা, এক ভাষা দ্বারা কখনো বা এক ধর্ম দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমারেখাতে কোন প্রাকৃতিক বিভাজন নেই। কিন্তু রাজনৈতিক সীমারেখা ভূখণ্ড দুটিকে আলাদা করে রেখেছে। যদিও ভাষাগত দিক থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। মাগধী প্রকৃত থেকে মুক্তি লাভ করে বাংলা ভাষা যখন স্বতন্ত্রতা লাভ করল এবং এই একত্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন বৃহৎ বঙ্গ গড়ে উঠেছিল তার একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশের উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা পাদদেশ অঞ্চল সেইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব দিকে গারো পাহাড়, খাসি পাহাড়, জয়ন্তী পাহাড় যা বাংলার উত্তরের প্রাকৃতিক সীমাকে নির্দেশ করে। গারো খাসি জয়ন্তিয়া পর্বতমালার বিন্যাস দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় বাংলার প্রাকৃতিক সীমা এই পার্বত্য আঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।[২] বাংলার পূর্ব প্রান্তে রয়েছে চট্টগ্রাম ও আরাকানের মতন পর্বতমালা। শ্রীহট্টের দক্ষিনে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্বতমালা এই দুটি জেলা থেকে শ্রীহট্টকে পৃথক করেছে। ত্রিপুরার উত্তর-পূর্বে ত্রিপুরা পর্বতশ্রেনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা থেকে পৃথক করেছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে নোয়াখালী এবং সমতল চট্টগ্রামের যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রা পর্বতশ্রেণি বাংলাদেশকে লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ থেকে পৃথক করেছে।[৩] উপরিউক্ত দুটি পর্বতশ্রেণি বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করে। বাংলার পশ্চিমে দিকে রয়েছে রাজমহল

পাহাড় ও ছটোনাগপুর মালভূমি। রাজমহাল থেকে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্য ভূমি দক্ষিণের সোজা প্রসারিত হয়ে একেবারে ময়ূরভঞ্জ বালেশ্বর স্পর্শ করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমি সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, মানভূম , সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জ বালেশ্বর কেওঞ্জর পর্বতমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি বাংলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা।[৪] বাংলার দক্ষিণাংশ পুরোটাই সমুদ্র ঘেরা। বাংলার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর দ্বারা নির্দেশত। অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উপকূল পর্যন্ত এবং পূর্বে গারো খাসি জয়ন্তিয়া ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যবর্তী যে নদী বিধৌত সমতল ভূমি রয়েছে বিশেষত ভাগীরথী কার্তোয়া ব্রহ্মপুত্র পদ্মা মেঘনা এবং আরো অসংখ্য নদী বিধৌত অঞ্চল নিয়ে এই বঙ্গভূমি গঠিত।[৫]

প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ

প্রথম দিকে এই নদী বিধৌত সমতল ভূমিতে অনেকগুলি ছোট ছোট জনপদ গড়ে উঠেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জনপদ গুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এসেছে। সময়ের আগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট ছোট জনপদ গুলোই একত্রীত হয়ে বৃহৎ বঙ্গের জন্ম দেয়। এই প্রাকৃতিক সীমার মধ্যেই যে সমস্ত জনপদের কথা জানা যায় তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল প্রাচীন বাংলা গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গা, বাঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি। নিম্নে এই প্রাচীন জনপদ গুলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হোল।

পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন: বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ ছিল পুণ্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বগুড়া দিনাজপুর রাজশাহী জেলার সমগ্রো আঞ্চল প্রাচীন কালে পুণ্ড্রদেশ নামে খ্যাত ছিল।[৬] আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে উল্লেখিত 'পুনলগল' পুন্ড্রনগর ও বগুড়ার মহাস্থান যে অভিন্ন এবং পুন্ড্রনগর যে পুন্ড্রদের আবাসস্থল পুন্ড্রবর্ধন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৭] যেখানে মহাস্থানে ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ বর্তমানে অবস্থিত তার পাশ দিয়ে কারতোয়ার ক্ষীণ প্রবাহ বর্তমান । এক কালে পুন্ড্রনগর এর পাশ দিয়ে এই নদীর প্রবল

জলধারা নিয়ে প্রবাহিত হতো তা সহজেই অনুমান করা যায় । একাদশ শতকে স্কন্দ পুরাণের 'পুণ্ড্র-খণ্ডে' কারতোয়া-মাহাত্ম্য থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] এছাড়াও চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান এর বর্ণনা থেকে পুন্ড্রনগর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তার বিবরণ অনুযায়ী কজঙ্গল ও কারাতোয়া নদী মধ্যবর্তী ভু-ভাগই পুন্ড্রবর্ধন এবং এই এলাকা কেন্দ্রে পুন্ড্রনগর বা মহাস্থান এবং যার উপকণ্ঠে ছিল বসুবিহার। রাজমহলে আঠারো মাইল দক্ষিণে কজঙ্গল থেকে গঙ্গা পার হয়ে য়ুয়ান চোয়াঙ পুন্ড্রনগরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে যে পশ্চিমে গঙ্গা পদ্মা থেকে পূর্বে কারতোয়া পর্যন্ত ভুল ছিল পুন্ড্রবর্ধন।[৯] পাল সেন আমলের লিপিমালায় গুরুত্বপূর্ণ জনপদ অঞ্চল হিসাবে পুন্ড্রবর্ধনের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত যুগের এর অনেক সমৃদ্ধ ঘটেছিল বলে জানা যায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণে সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্রবর্ধনের প্রাকৃতিক সীমা বা ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি ঘটেছিল। পাল আমলে পুন্ড্রবর্ধন ব্যাঘ্রতটি মন্ডল পর্যন্ত এবং সেন আমলে খারিমন্ডল ও বাখরগঞ্জ সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১০]

গৌড়: গৌড় একটি সুপ্রাচীন জনপদ ছিল এ বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা জানতে পারি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের উল্লেখ আছে।। পুরণে গৌড় দেশের নাম উল্লেখ রয়েছে। পানির সূত্রে থেকে গৌড়পুর এর নাম পাওয়া যায়।[১১] বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থের শশাঙ্ক কে গৌড় অধিপতি বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] এতে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় এক দেশ বলে মনে হয় । কারণ সপ্তম শতকে লিপিতেও শশাঙ্ক গৌড় কর্ণসুবর্ণ রাজ বলে আখ্যায়িত হয়েছেন । চীনা পরিব্রাজক যুযান চুয়াং শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। যদিও এই জনপদটির অবস্থান সঠিক ভাবে নির্নয় করা বেশ শক্ত। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে মালদাহ ও মুরর্শিদাবাদ অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল। ঈশান বর্মণের হারাহালি লিপিতে গৌড় জনপদটি সুমুদ্র তীরবর্তী বোলে উল্লেখ করা হয়েছের।[১৩] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অয়তনের ও পরিধির পরিবর্তন হয়েছে নিঃসন্দেহে। বাংলার প্রাচীন জনপদ সমূহের যুগে জনপদের আয়তন সম্প্রসারনের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত 'গৌড়'। এর আয়তন ও খ্যাতি এতটাই বৃদ্ধিপেয়েছিল যে , এক সময় সমস্ত বাংলাকেই গৌড় দেশ বোলে আখ্যায়িত করা হত। প্রথম দিকে সনর্কীর্ন অর্থে গৌড় বলতে মুর্শিদাবাদ জেলা ও

মালদা জেলার দক্ষিণ অংশ কে বোঝাত। শশাঙ্কের সময় গৌড় দেশটি এতটাই বিস্তার লাভ করেছিল যে এ সময় বঙ্গ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ গৌড় নামে আখ্যায়িত হত। কামসুত্রের টীকাকার যশোধরের মতে গৌড় দেশ কলিঙ্গ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাঢ়: সূক্ষ্ম নামক জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এর নাম উল্লেখ দেখা যায়।[১৪] বৃহৎ সংহিতআয সুক্ষ্মোর অবস্থান বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৫] সুঙ্গের সাথে সম্প্রর্কিত অপর জনপদ রাঢ়। জৈন অচারঙ্গ সূত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। যদিও জৈন অচারঙ্গ সূত্রে "লাঢ়" বলে উল্লেখ আছে।[১৬]রাঢ় আআঞ্চলটি জাতিবাচক রাঢ়া শব্দ হতে উৎপন্ন বলে আনেকে মনে করেন। নবম-দশম শতক হতেই এই প্রখ্যাত জনপদটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়। আবার রাঢ়রের দক্ষিণতম অংশ ছিলস সূক্ষ্ম ভূমি যা দক্ষিণ রাড় হিসাবে এবং উত্তর অংশ বজুভূমি বা উত্তর রাড় নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায সূক্ষ্ম অ রাঢ় অভিন্ন বলে মনে করেন।[১৭] বাংলার সেন রাজাদের পূর্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথম রাঢ় আঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ভাট্টভদেবের ভুবনেশ্বর প্রশ্বস্তিতে রাঢ় আঞ্চল কে জনবিহীন শুষ্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ধমান আঞ্চল এইরকম শুষ্ক। সুতরাং রাঢ় বলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের সমগ্র ভূ-ভাগ কেই বোঝান হত।[১৮] ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত ছিল। ষোল শতকের পর্যটক জাও দ্যা বারবোসা নকশায় এই বিভাগটি কেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ কথা বলা যেতে পারে যে বর্তমান ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা হতে দক্ষিণবঙ্গে সাগর পর্যন্ত সম্ভবত তাদের বিস্তৃত ছিল।[১৯]

সমতট: প্রাচীন বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অংশে একটি জনপদ ছিল। খ্রিঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপিতে সর্বপ্রথম সমতট জনপদের নাম উল্লেখক পাওয়া যায়।[২০] ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির এর বঙ্গসংহিতায় সমতট জনপদের উল্লেখ আছে। খ্রিঃ সপ্তম শতকে উৎকীর্ণ শী ধারণ রাতের কনলাই তাম্রশাসন, অষ্টম শতকে উৎকীর্ণ ভবদেবের তাম্রশাসন এবং দশম শতকে উত্তীর্ণ শ্রী চন্দ্রের পশ্চিম ভাগ

তাম্রশাসন অনুযায়ী দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে দেবপর্বত ছিল সমতটের রাজধানী।[২১] এ নগরটি ছিল কুমিল্লা শহর থেকে অনতিদূরে ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীর দক্ষিণে চন্ডীমুড়া শৃঙ্গে। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে কুমিল্লা জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ত্রিপুরা নোয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত ছিল সমতাট রাজ্য। আবার দশম শতকে প্রথম মহিপাল নির্মিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামের প্রাপ্ত মূর্তি লিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মনে হয় ত্রিপুরা জেুরত ছিল সমতাটের প্রধান কেন্দ্র। অন্যদিকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ও প্রমুখদের বিবরণী অনুযায়ী মেঘনার পূর্বাঞ্চল বর্তমানে কুমিল্লা ত্রিপুরা ও নোয়াখালী কিছু অংশ নিয়ে ছিল সেকালের সমতট।[২২] এতে রাজত্ব করেছেন খডগ ও চন্দ্র বংশের রাজারা। সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চুয়ান এই অঞ্চলকে নব্য, অদ্র ও সমুদ্র তীরবর্তী এবং কামরূপের দক্ষিনে বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তম শতকের শেষার্ধে আরেক চীনা পরিব্রাজক ইৎসিয়ের এর বর্ণনায় সমতাটের নামক রাজার এর উল্লেখ আছে। এই রাজভট সম্ভবত খডগ রাজবংশভূত এবং খডগ রাজবংশের রাজধানী ছিল কর্মান্ড। ১২৩৪ সালে দামদর দেবের আপ্রকাশিত মেহার পট্টোলীতে যে ধরনের ইঙ্গিত মেলে তাতে মনেহয় ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র।[২৩]

হরিকেল: হরিকেল এর নাম সপ্তম শতকের শেষ পর্বে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং-এর ভ্রমণ কাহিনীতে প্রথম পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত সীমান্তে সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ হিসাবে মনে করা হয়। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় তিনি সপ্তম শতাব্দীতে সিংহ এসেছিলেন এবং এটি পূর্ব ভারতের পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খ্রি। নবম শতাব্দীর কান্তিদেবের তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হলে এই ধারনা আর মজবুত হয়।[২৪] নবম শতকের শেষভাগে রাজশেখরের কর্পুরমঞ্জুরী পূর্বদেশীয় চাম্পা, রাড় ও হরিকেলীর উল্লেখ রয়েছে।[২৫]

তাম্রলিপ্ত: তাম্রলিপ্তের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত ভীমের দ্বিগবিজয় প্রসঙ্গে পুরানে জৈন কল্পচিত্রের প্রজ্ঞাপন গ্রন্থে দশকুমারচরিত বুদ্ধ জাতক কাহিনী ও অন্যান্য

গ্রন্থ তাম্রলিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় প্রজ্ঞাপন গ্রন্থে বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত বঙ্গের অধীনে ছিল দশকুমারচরিত বলা হয়েছে তাম্রলিপ্ত সুখের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাছাড়া টলেমি ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং ইয়াসমিন প্রমুখ পরিব্রাজকের ভ্রমণ বিবরণীতে তাম্রলিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় এছাড়া শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি ও রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালা লিপিতে তাম্রলিপ্ত নামের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে তাম্রলিপ্ত সাথী ছিল সর্বত্র।[২৬]

বঙ্গ: বঙ্গ একটি সুপ্রাচীন জনপদ সর্বপ্রথম ঐতরেয় আরণ্যক এ বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গ জাতি হতে বঙ্গ জনপদের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন প্রণিধানযোগ্য। তার মতে প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ দেশ ও জনপদের নাম জাতিবাচক নাম হতে গৃহীত । এই কারণে সংস্কৃত দেশ নামে সাধারণ বহুবচন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গজাতি অধ্যুষিত জনপদ হলো বঙ্গদেশ।[২৭] অবশ্য শব্দটি চিনা শব্দ তিব্বতীয় শব্দ এবং শব্দট্রির বং অংশের মৌলিক অর্থ জলাভূমি বলে অনেকে মনে করেন।[২৮] যারা জলাভূমির দেশে বংশপরম্পরায় বসবাস করতেন তাদের বঙ্গ বা তাদের আবাস ভূমি বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হয়েছে। সে যাই হোক এই বঙ্গ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় দেশ। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে, রামায়ণ, শিলালিপি ইত্যাদি হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যে বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়, গঙ্গার প্রধান দুই স্রোত ভাগীরথী এবং পদ্মা মধ্যবর্তী যে ত্রিভুজ আকৃতি ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বঙ্গদেশে হিসাবে অভিহিত এবং এই ভূভাগই সম্ভবত টলেমির গঙ্গারিডাই।[২৯] বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ হতে অনুমান করা হয় যে, ময়মনসিংহ জেলা অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ এর পূর্ব সীমা নির্ধারণ করেছে। সম্ভবত সুন্দরবনের পূর্ব প্রান্ত হতে ব্রম্মপুত্রের প্রবাহিত স্রোতধারার মধ্যবর্তী ভূভাগই ছিল বঙ্গ। সেন লিপিমালাতেও এ ধরণের ইঙ্গিত রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গ জনপদের সীমা সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন সাধারনত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণ সমুদ্র তীরে এর সীমারেখা ছিল।

বঙ্গাল: একাদশ শতক থেকে বাঙ্গাল নামে প্রাচীন বঙ্গের আরেকটি বৃহৎ জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে রাজেন্দ্ চোল কর্তৃক উৎকীর্ণ তিরুমলয় শিলালিপি ও সমসাময়িক কালের আরো কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে বাঙ্গাল দেশের নাম উল্লেখ আছে। এ নীতিগুলি থেকে মনে করা হয় যে বঙ্গ ও বাঙ্গাল দুটি পৃথক জনপদ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রণীত নরচন্দ্র সুরীর হাম্মির মহাকাব্য এবং সিরাজ আশিক রচিত গ্রন্থ তারিখ ই ফিরোজশাহী আলাদা আলাদা ভাবে বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] অনুমান করা হয় যে দক্ষিণ রাঢ়ের পরই ছিল বঙ্গাল দেশ এবং এই দুই দেশের মধ্যবর্তী ছিল গঙ্গা ভাগীরথী। গোবিন্দচন্দ্রের পূর্বপুরুষ চন্দ্র বংশীয় রাজা তৈলক্য চন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা হয়েছিলেন ছিলেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার ধারণা করেন আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রখ্যাত নৈয়ায়িক চন্দ্র গোমিনের নামানুসারে খ্যাত চন্দ্রদ্বীপ সম্ভবত প্রাচীন বাখরগঞ্জ জেলাধীন বাকশা চন্দ্রদ্বীপই প্রথম বঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমান সিলেট জেলায় আবিষ্কৃত শ্রী চন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন সাক্ষ্য দেয় এ সময় সিলেট পর্যন্ত চন্দ্র রাজ্য বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল। সম্ভবত একাদশ শতকে সমগ্র পূর্বাঞ্চল ও সমুদ্রতট দক্ষিণবঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলার জনপদ। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন তখন চন্দ্রদ্বীপ ও হরিকেলও বঙ্গাল দেশের অংশ বিশেষ ছিল।[৩১]

বংলাদেশ নামের উৎপত্তি প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নামে কোনো পৃথক রাজ্য বা জনপদ ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশে নামে যে সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে সেই সীমারেখা ভিতরে পূর্বোক্ত পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, বঙ্গাল, বরেন্দ্রী, প্রভৃতি জনপদ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলির অবস্থিত ছিল। এভাবে বিভিন্ন শাসক কর্তৃক আবার কোন কোন সময় একই শাসনের অধীনে এক বা একাধিক রাজ্য রাজ্য শাসিত হত। বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল লিখেছেন যে বাংলাদেশের প্রাচীন নাম ছিল এই বঙ্গ। এই বঙ্গ শব্দের সাথে আল শব্দটি যোগ করে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া আল নির্মাণ করতেন বলে পরবর্তীকালে বঙ্গাল বা

বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়।[৩২] বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশের নাম নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশে বাংলা নামকরণ হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৩৩]

বৌদ্ধ জনবিন্যাস

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের বাংলা তথা ভারতে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রায় দুইশত বছর পর ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সেই স্বাধীনতা বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাধারণ জনগণের কাছে সুখকর হয়নি। ভারত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। সেই সঙ্গে বাংলাও দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। এমনিতেই বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্মের লোকসংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা হিসেব যদি দেখা যায় তাহলে বাংলা প্রদেশের ৮৪৯৭৪ জন বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করতেন।[৩৪] আসামে ছিল আরো কম মাত্র ১৫২১ জন।[৩৫] ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অখণ্ড বাংলাতে বাঙালি বৌদ্ধরা মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতেন। কিন্তু দেশভাগের পরে নানাবিধ করনে বাঙালি বৌদ্ধরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছেড়ে ভারতে চলে আসেন। এই ছিন্নমূল মানুষ গুলোর অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রাচীন কালে এই বাংলাতে যে বৌদ্ধ ধর্মের আধিক্য ছিল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে তা বেশ বোঝা যায়।[৩৬] আতি সাম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন মালদা জেলার জগজ্জীবনপুর বৌদ্ধ বিহার ও মেদিনীপুরের দাঁতন থানার মোগলমারির বৌদ্ধ মহাবিহার।[৩৭] কালের নিয়মে বাঙালি বৌদ্ধরা সংখ্যা লঘূতে পরিণত হয়। ১৯৮১ সালের জনগণনা আনুযায়ী বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুসের সংখ্যা ছিল ৫৩৮০০০ জন প্রায়।[৩৮] বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ০.৬০ শতাংশ জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[৩৯] বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ০.৩১% মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[৪০] পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস সব থেকে বেশি। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় সব থেকে বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। সেই তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে খুব স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছে।

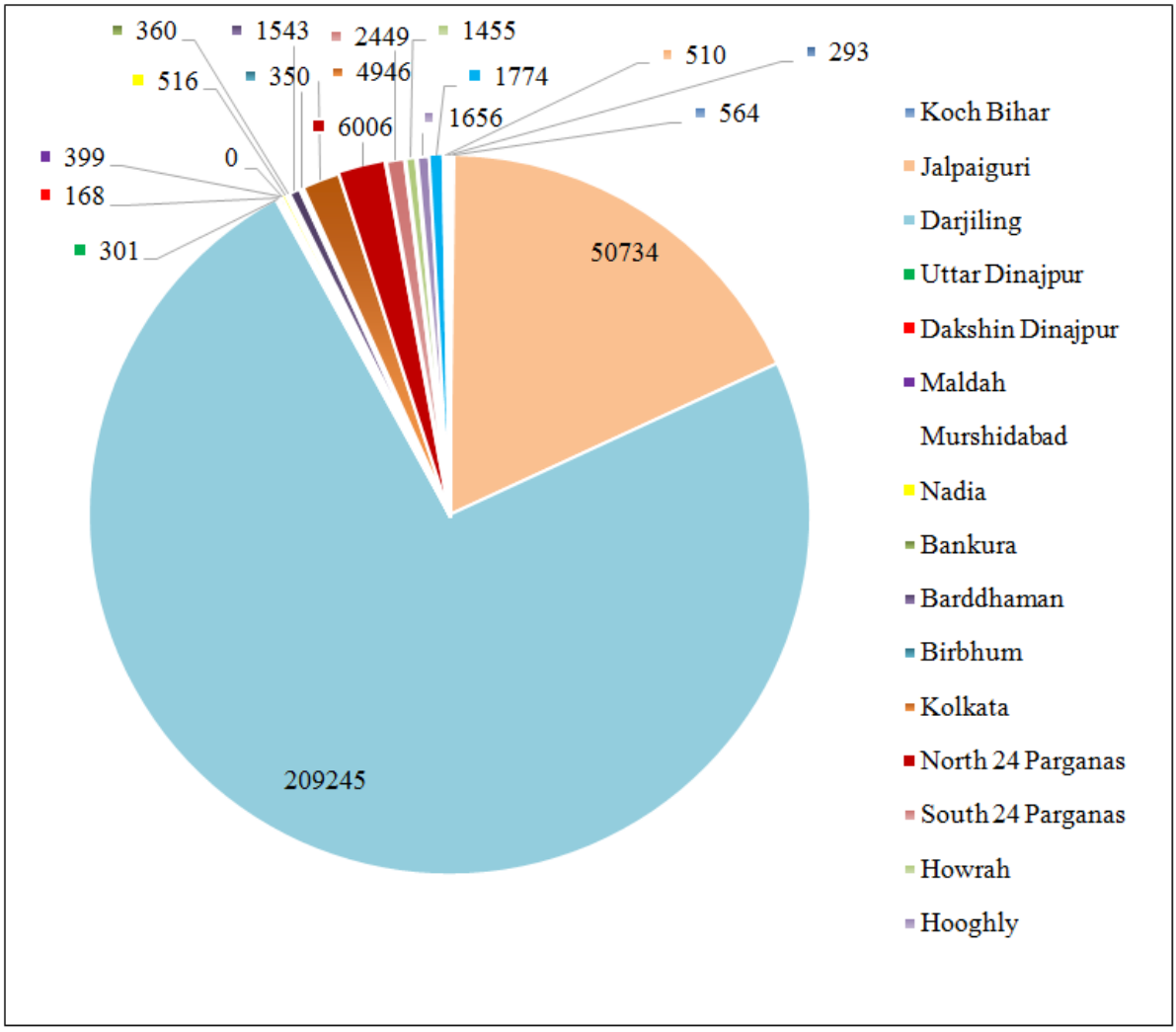

চিত্র. ১: পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনসংখ্যার জেলা ভিত্তিক বিতরণ (২০১১)

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চোদ্দতম রাজ্য হিসাবে পরিগণিত। এর আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কি.মি.। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৯,১৩,৪৭,৭৩৬ জন। এর মধ্যে ২০১১ এর জনগণনানুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বৌদ্ধদের জনসংখ্যা ২,৮৩,২৭০ জন।[৪১] উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এদের সংখ্যা সর্বাধিক, যেমন-জলপাইগুড়ি জেলায় ৫০৭৩৪ (১.৩১%), দার্জিলিং জেলায় ২০৯২৪৫ (১১.০৩৩%), কোচবিহারে ৫৬৪ (০.০২%), উত্তর দিনাজপুরে ৩০১ (০.০১%), দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৬৮ (০.০১%) ও মালদহে ৩৯৯ (০.০১%)। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এদের মোট জনসংখ্যা ২৬১৪১১ জন। দক্ষিনবঙ্গের মধ্যে নদীয়াতে ৫১৭ (০.০১%), বাঁকুড়াতে ৩৬০ (০.০১%), বর্ধমানে ১৫৪৩ (০.০২%), বীরভূমে ৩৫০ (০.০১%), কলকাতায় ৪৯৬৪ (০.১১%), উত্তর ২৪ পরগনায়

৬০০৬ (০.০৬%), দক্ষিন ২৪ পরগনায় ২৪৪৯ (০.০৩%), হাওড়ায় ১৪৫৫ (০.০৩%), হুগলীতে ১৬৫৬ (০.০৩%), পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৭৭৪ (০.০৩%), পূর্ব মেদিনীপুরে ৫১০ (০.০১%) ও পুরুলিয়া জেলাতে ২৯৩ (০.০১%) বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন।

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাচীন বাংলা পুণ্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পর থকেই এই জনপদগুলিতে এই ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পরবর্তীকালে এই জনপদগুলি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'বাংলা' এই ভৌগোলিক পরিচিতি পায়। এখানেও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন।

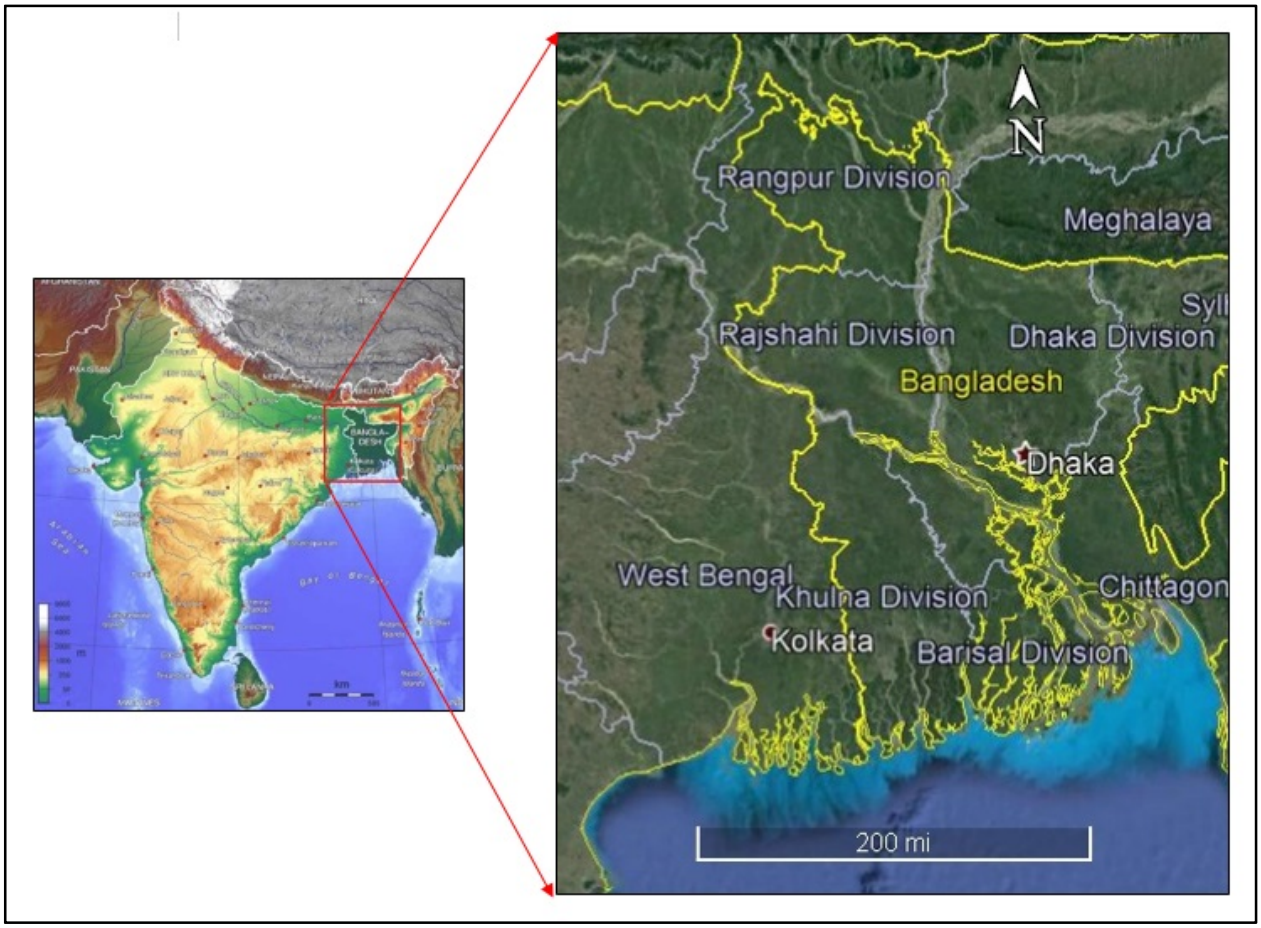

চিত্র. ২: অধ্যয়ন এলাকার অবস্থান মানচিত্র

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), পৃ. ১২৩।

২. *তদেব*।

৩. *তদেব*।

৪. *তদেব,* পৃ. ১২৫।

৫. কল্যাণ রুদ্র: *বাংলার নদীকথা,* (কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৮)

৬. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১২৫।

৭. জাকিরুল হক: *বাংলাদেশ এবং বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* (ঢাকা,পুথিনিলয়, ২০১৬)।

৮. ড. ভূপ্রেন্দ্রনাথ দত্ত: বাঙ্গালার ইতিহাস, (কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৪২১)।

৯. আবদুল মনিম চৌধুরী: বাংলার ভৌগলিক পরিচয় (প্রবন্ধ), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১)।

১০. এস.এম. রফিকুল ইসলাম: *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসঃ সেন যুগ,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ.১২

১১. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১৮৮।

১২. জাকিরুল হক: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩।

১৩. *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, চতুর্থ খণ্ড,* পৃ. ১১৭।

১৪. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১১৬।

১৫. এস.এম. রফিকুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত*।

১৬. আবদুল মনিম চৌধুরী: *প্রাগুক্ত*।

১৭. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত): *মহাভারত,* পৃ.১৪২।

১৮. আবদুল মনিম চৌধুরী: *প্রাগুক্ত*।

১৯. এস.এম. রফিকুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত*।

২০. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১৭৮।

২১. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া: *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি,* পৃ. ১৫।

২২. আবদুল মনিম চৌধুরী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৯-২০।

২৩. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্তপৃ.* ১৭৮।

২৪. জাকিরুল হক: *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৭।

২৫. এস.এম. রফিকুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত* পৃ. পৃ.২৭-৩৩।

২৬. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ১২৪-১৫১।

২৭. সুকুমার সেন: *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড,* পৃ. ৩।

২৮. সুকুমার সেন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২।

২৯. এস. এম. আলী: *জিওগ্রাফি অফ পুরাণ,* (নিউ দিল্লি, পিউপুল পাবলিশিং হাউস ২০০১), পৃ-১৫১।

৩০. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১৪২।

৩১. নীহাররঞ্জন রায়: *প্রাগুক্ত।*

৩২. Abul Fazal: *Ain-I-Akbari*, Cot H.S. Jerret, 1974.

৩৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস- প্রাচীনযুগ*।

৩৪. *The Census of British India of 1871-72*, Statistical Society of London, 1876.

৩৫. *The Census of British India of 1871-72*, Statistical Society of London, 1876.

৩৬. Buddhist and Brahmanical Sculptures in tha Dacca Museum, Nalinikanta Bhattasali, Bangladesh National Museum.

৩৭. *পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার,* তথ্য ও সংকৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩৮. Bangladesh Bureau of Statistics.

৩৯. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Bangladesh

৪০. Census Report of 2011.

৪১. ভারতের জনগণনা, ২০১১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্থান - বিকাশ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে ৬৩টি প্রতিবাদী ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তক। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ সালে হিমালয়ের পাদদেশে লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমনণকালে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর স্বরূপ দেখে অনুধাবন করেন জগতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমান বেশি। এদুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ২৯ বছর বয়সে তিনি রাজ সিংহাসন, সুন্দর স্ত্রী, পিতা ও সদ্যোজাত শিশুপুত্রসহ সব কিছু ত্যাগ করে সন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। দুঃখজয়ের পথের সন্ধানে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর অবশেষে এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ চরম সত্য বোধি লাভ করে বুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হন (খ্রি.পূ. ৫৮৮)।[১] ঋষিপতন মৃগদাব অর্থাৎ সারনাথে তিনি সর্বপ্রথম সকল প্রাণির সুখ ও কল্যাণার্থে সত্যধর্মের প্রচার আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি বিরামহীনভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সকল প্রাণির মঙ্গল কামনায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার বাণী প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মর্মবাণী হলো—এ ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য; এ ধর্মপালনে কোনো কালাকাল নেই। এ ধর্মে কোনো জাতপাত/জাত অজাত নেই, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসও নেই। ‘এসো, দেখো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মনঃপুত হলে নৈর্বানিক ধর্ম গ্রহণ করার’ বুদ্ধের এ নিরপেক্ষ ও যুগোপযুগী আহ্বান সকল স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল।[২] তারা দলে দলে দীক্ষিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মে। সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে অর্থাৎ খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বাংলার পালযুগের অবসান পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর বৌদ্ধধর্ম এ উপমহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের পটভূমি

গৌতম বুদ্ধের নীতি ধর্ম কেন অন্যান্য সব ধর্মমতকে অতিক্রম করে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে এবং সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ও গবেষকগণ বিশ্লেষণ করেছেন। কারো কারে মতে যজ্ঞে পশুবধ নিবারণের জন্যই বুদ্ধ অহিংসা পরম ধর্ম এই মত প্রচার করেন। 'অশ্বমেধ যজ্ঞ', 'সোমযোগ' ইত্যাদি যজ্ঞে যে বহু পশু বলি হত তাতে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মতে উপনিষদ আশ্রয় করেই বুদ্ধদেব নির্বাণতত্ত্ব প্রচার করেন। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ ও নির্বাণে বিশেষ কোন তফাত নেই। শংকরাচার্য যে বৌদ্ধদের 'অর্ধ বৈনাশিক' ও 'পাষণ্ড বৈতণ্ডিক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনিও রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের অদ্বৈতবাদ এবং বুদ্ধদেবের নির্বাণতত্ত্ব সমার্থক।

তৃতীয় মতে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্য দর্শনের অষ্ট বিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চ ভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, অষ্ট সিদ্ধির অনুরূপ বুদ্ধদেবও তাঁর ধর্মে পঞ্চ স্কন্ধ, চার আর্য সত্য, পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদি সত্য ও পালনীয় কর্তব্যের কথা বলেছেন। সাংখ্যদর্শন যেমন জন্ম, জরা, মৃত্যুর ক্লেশ নিবারণ করতে চেয়েছিল তেমনি বুদ্ধও এই তিন দুঃখকে জয় করার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। সাংখ্যমতে 'আত্মা' আছে কিন্তু বুদ্ধের মতে 'আত্মা' বলে কিছু নেই। অনেকের মতে ব্রাহ্মণের অত্যাচার ও শোষণ থেকে আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য বুদ্ধেদেবই বেদবিরোধী, যজ্ঞ বিরোধী মতের প্রচার করেছিলেন।

কেউ কেউ শাক্য শব্দ থেকে শক উৎপন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মেছেন এবং তাঁর ধর্ম শকদের ধর্মের অনুরূপ।

আবার কারো কারো মতে বুদ্ধ ও জরাথ্রুষ্টদের আহুরমাজদা ও আহরিমান মাত্র। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যেখানে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল সেখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করত। কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধ এই থাড়ু জাতির ধর্ম সংস্কার করে উত্তর ভারতের অনেক দেশে প্রচার করেন।[৩]

এই সমস্ত অভিমতের কথা মনে রেখে অনেকে বুদ্ধ আর্য ছিলেন কিনা সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে বুদ্ধ ইক্ষাকুবংশে জন্মান। তাঁর গোত্র গৌতম, গৌতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদি গুরু। গৌতমের নাম থেকেই শাক্য সিংহকে গৌতম নামে ডাকা হয় এবং ইক্ষাকু বংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। সুতরাং বুদ্ধ যে আর্য ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অহিংসা পরম ধর্ম বুদ্ধের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধের সমকালে উদ্ভুত হয়েছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। শক জাতির ধর্ম থেকে বুদ্ধের ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছিল একথাও অযৌক্তিক। কেননা, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে শুঙ্গ রাজাদের আমলে শকরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম যে সাখংখ্যমতের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিল তা অশ্বঘোষ স্বীকার করেছেন। বুদ্ধের গুরু অড়ার কালাম ও উদ্রক দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন।[৪]

সাংখ্যমতের প্রবক্তা কপিল মুনির আবাসস্থল বঙ্গ-মগধ ও চের জাতি অধ্যুষিত অনার্য পূর্বাঞ্চলে। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দির আছে। কপিলবাস্তু কপিল মুনির বাস্তু। কপিল মুনি পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর দর্শন এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব এই পূর্বাঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্বাঞ্চল আর্য-অধিকারের সীমা থেকে দূরে ছিল। আর্যরা যখন যাগ, যজ্ঞ, পশুবধ ইত্যাদি করে দেবতাদের কাছ থেকে ধন ঐশ্বর্য পরমায়ু কামনা করেছিলেন, তখন পূর্বাঞ্চলের বুদ্ধের পরে বুদ্ধ, তীর্থঙ্করের পর তীর্থঙ্কর ইহকালের দুঃখমোচন ও পরকালের সুখের জন্য নানা পথ উদ্ভাবন করেছিলেন।[৫]

কপিল মুনির সাংখ্য মতবাদ এবং আর্য প্রভাব বর্জিত পূর্বাঞ্চলীয় জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন মতবাদের বিশেষত বৌদ্ধমতের উদ্ভবের পশাচতে একটি সঙ্গত কারণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। আধুনিক গবেষকদের মতে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে এতগুলো ধর্মসম্প্রদায় উদ্ভব হওয়ার পশ্চাতে এমন একটি সামাজিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যা প্রাচীন ধর্ম মতগুলোর দ্বারা নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গাঙ্গেয় অঞ্চলে যে 'নব্য শ্রেণী'র উদ্ভব হয়েছিল তা অনস্বীকার্য।

পশুপালক নব্য বৈদিক বৈশ্য সম্প্রদায়ের জায়গা দখল করেছিল কৃষিজীবিরা। ফলে গোত্র-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে এবং দ্রুতগতিতে বণিক শ্রেণীর বিকাশ ও প্রসার ঘটে এবং পূর্বাঞ্চলীয় নগরে 'শ্রেষ্ঠী'গণ বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করে। বস্তুত শ্রেষ্ঠীগণ সেখানে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকে পরিণত হয়েছিল। এমনকি, স্বৈরাচারী রাজারাও শ্রেষ্ঠীদের যথেষ্ঠ সমাদর করতেন। যদিও রাজনীতিতে তাঁদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। বৈদিক যাগযজ্ঞের কারণে উদ্ভূত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কৃষিজীবী এবং বণিক শ্রেণী উভয়েই নিরাপত্তার অভাব বোধ করত। স্বভূমি এবং স্বগোত্রের বাইরে বাণিজ্যের সুবিধার্থে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্যে পশুবলির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নিয়মিত কৃষিকাজের উপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যেই দেখা যায় শুধু বুদ্ধ নয়, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণও স্পষ্টভাবে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা যে কোন বর্ণের মানুষের হাতের রান্না করা খাবার গ্রহণ করে আর্যাচারের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। নব্য সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা প্রায় সকলেই ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই পদ্ধতি খাদ্য সংগ্রহেরই নামান্তর। কঠিন কৃচ্ছসাধন কৌমার্যব্রত পালন, ধন সম্পত্তি অধিকারে অনীহা সমাজ-দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্ট।[৬] বস্তুত সমাজের পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলোর দ্বান্দ্বিক সংঘাতের ফলেই বুদ্ধের ধর্মের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আবার কারো কারো মতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে গোত্রপ্রধান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ভূমিসীমা রক্ষা জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে 'সাধারণতন্ত্র' এবং 'রাজতন্ত্রের' সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ঘটে। শাক্য গোত্রের প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রে বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। সাধারণতন্ত্রগুলোতে রাজতন্ত্রের তুলনায় ব্যক্তির স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা ছিল কম এবং উদার মতাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণুতার মাত্রা ছিল বেশি। পূর্ব অঞ্চলের সাধারণতন্ত্রগুলো গাঙ্গেয় সমতলের কম রক্ষণশীল ছিল। উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও গোত্র প্রধান সাধারণতন্ত্রগুলি খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক টিকে ছিল। এসমস্ত অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাকৃত অধিক সমর্থন পেয়েছে এবং গ্রীক, শক, কুষাণ এবং হূণ জাতির লোক সহজ ভাবেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। নগরের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বণিক ও কারিগরদের সংখ্যাও বেড়ে চলে।

বিভিন্ন ছোট ছোট কারিগর শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর ঘটে। নগরকেন্দ্রিক এই রূপান্তর প্রক্রিয়া ধর্ম ও দর্শনেও প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত রক্ষণশীল মতকে উপেক্ষা করে নতুন নতুন মতের উদ্ভব হয়। পূর্বতন রক্ষণশীলতা থেকে তা ক্রমশ সিদ্ধান্তবাদ এবং পরে জড়বাদী দর্শনে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এক অর্থে নাস্তিকবাদী। উভয় ধর্মই বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ আচার অস্বীকার করেছে। উভয় ধর্মই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে নিজে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে চেয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে বৈশ্য সম্প্রদায় প্রাধান্য পেয়েছে, ধন-সম্বলের দিকও থেকে শক্তিধর হলেও সমাজে তারা কোন মর্যাদার আসন পায়নি। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও প্রসারে বৈশ্য সম্প্রদায় বিশেষত শ্রেষ্ঠীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[৭] বৌদ্ধ ধর্ম নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নিজ ধর্মে স্থান দিলেও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে তা কোন নির্দিষ্ট আন্দোলন ছিল না।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন,

> "বুদ্ধ দুঃখ বলতে জাগতিক দুঃখকেই বুঝেছিলেন, এবং তাঁর আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই সংঘসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে। ধনবৈষম্যের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাসমূহ দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ধনিক শ্রেণীর সীমাহীন লোভ, সমস্ত বিষয়ের উপরই বুদ্ধের সুচিন্তিত মন্তব্য আছে।...বৌদ্ধ সংঘগুলির ভিতরকার নিয়মাবলী ছিল পুরোদস্তর গণতান্ত্রিক, একেবারে ট্রাইবাল নিয়মসমূহ বসানো এবং সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান ছিলনা। হারিয়ে যাওয়া সাম্যাশ্রয়ী জীবনের আদর্শ সংঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেই বুদ্ধ ক্ষান্ত হন নি তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে সংঘবাসী ভিক্ষুরা বাইরের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখে।।.. রাষ্ট্র ও শ্রেণীসমাজের অনিবার্যতা রোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, এবং এই অবস্থাই তিনি যা করতে পারতেন, এবং প্রশংসনীয় ভাবে যা করেছিলেন তা হচ্ছে নতুন গড়ে ওঠা সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলিকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করা, এবং হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল জীবনের কিছু নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটানো।"[৮]

পরিবর্তন সমাজের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবেই অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণের পথ উদ্ভাবন করেছিলেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তিনি পরিব্রাজকের বেশে শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে পরিভ্রমণ করেছিলেন। দেখেছিলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ। কায়েমী স্বার্থের গায়ে আঘাত না করে তিনি তাঁর 'মধ্য পন্থানুযায়ী' মানুষের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আপামর মানুষের কাছে একটি বিকল্প আশ্বাসের বাণী পৌছে দিতে হয়েছিল যে জন্ম, জরা, মরণের দুঃখ লাঘব করে পরলোকে সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্যাপক জনগণের কাছে যাওয়া যে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁর একটি প্রধান দিকও ছিল তাঁর মুখের ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা স্তরের ভাষা যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বুদ্ধ সেই সমস্ত অঞ্চলেই (কল্পিলাবস্তু, গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কুশীনগর, কোশল, কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ, কৌশাম্বী) ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মুখের ভাষা যদি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা স্তরের ভাষা হয় তাহলে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ভাষাও পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। তাই বলা যায় বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিবর্তন ধারাও একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও বিকাশ

প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ও বৌদ্ধ সাহিত্য হতে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম এককালে প্রাচীন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর নিকট সর্বপ্রথম দীক্ষিত পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু কোণ্ডিয়, ভদ্দীয়, বাপপ, মহানাম ও অশ্বজিৎ, কুলপুত্র যশ, চার গৃহীপুত্র এবং ৫০ জন কুলপুত্র সমন্বয়ে সর্বমোট ৬০জনের যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাদের প্রত্যেককে সকল প্রাণির কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচারের আদেশ দান করেছিলেন। বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্মপ্রচারকালে বাংলায় এসেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে

কিছু কাহিনী, কিংবদন্তী বা কিছু বিক্ষিপ্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধ এদেশে এসেছিলেন এবং তাঁর মুখ নিসৃত বাণী প্রচারের মাধ্যমে তিনি বংলা ও বাঙালি জাতিকে ধন্য করেছিলেন। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য জানিয়েছেন—"এসব লোক পরম্পরা কথা, কাহিনী ও কিংবদন্তীর মধ্যে সমস্ত বা আংশিক ইতিহাস সুপ্তাবস্থায় থাকে।"

সারনাথে ধর্ম চক্র প্রবর্তনের পর গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং ঊরূবেলার সেনানী গ্রামে ধর্ম প্রচার কার্যে গমন করেন।[৯] মগধ রাজ বিম্বিসার (খ্রি.পূ. ৫৫৮-৪৯১) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর শাক্য, লিচ্ছবি ও মল্লরাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাছাড়া দাঠাবংশ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়—বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার নয় মাস পর পৌষ পূর্ণিমার দিন শ্রীলঙ্কার মহানাম বনে গমন করেন।[১০] গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের আটবছর পর ভিক্ষু গবম্পতির প্রার্থনায় বর্তমান মায়ানমার (বার্মা) প্রাচীন রামঞ্ঞ রাষ্ট্রের সুধর্মপুরে উপনীত হন।[১১] গৌতম বুদ্ধ যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন মগধ অঞ্চলের চান্দা সুরিয়া (চন্দ্রসূর্য) নামক সামন্ত রাজা আরাকানে ধান্যবতী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতেন। চান্দা সুরিয়া ও তাঁর বংশ ধরেরা খ্রি.পূ. ৫৮০ থেকে ৩২০ খ্রি. পর্যন্ত এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন বলে জানা যায়।[১২] বুদ্ধভক্ত এ রাজা গৌতম বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করলে তিনি পাঁচশত অরহৎ ভিক্ষু নিয়ে ধান্যবতী রাজ্যে গমন করেছিলেন।[১৩] মায়ানমার রাজাদের 'রাজবংশ' নামক ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুসহ মায়ানমার গমন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মায়ানমারে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে বুদ্ধের সেদেশে গমনকালে বিশ হাজার অরহৎ ভিক্ষু সাথে ছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] Dr. Earnest Halenyi-র সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বছর পর মায়ানমার অপরান্ত প্রদেশের বণিজ্জগণ গ্রামের চুন্নপন্ন ও মহাপন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মিত চন্দন কাঠের বিহারে বসবাসের আমন্ত্রণ জানালে বুদ্ধ সেখানে গমণ করেন।[১৫] এখানে একসপ্তাহকাল অবস্থান করে তিনি ধর্মপ্রচার করেন। মহাব্গগ পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তম সপ্তাহের শেষ দিন রাজায়তন বৃক্ষমূলে অবস্থানকালে উক্লাপবাসী তপপসু ও ভল্লিক নামক দুই বণিক মধু ও মধু মিশ্রিত পিঠা দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেন। এরা দুজন গৌতম বুদ্ধের গৃহী উপাসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[১৬]

পণ্ডিতদের মতে বর্তমান উড়িষ্যাই উক্কল উকলাপ বা উৎকল নামে পরিচিত। তখনকার দিনে শকটযানে ব্যবসা করা সুবিধাজনক ছিল বর্তমান উড়িষ্যা থেকে মগধের পথে শকটযানে চলাচল করাও সহায়ক ছিল।

গৌতম বুদ্ধ বণিকদ্বয়ের দানকৃত মধু ও পিঠা ভোজন করে ৮টি কেশ প্রদান করলে তাঁরা তা স্বদেশে নিয়ে প্যাগোডা নির্মাণ করেন। মায়ানমারের রাজধানী রেঙ্গুন শহরের সোয়েডাগন প্যাগোডায় উক্ত পবিত্র কেশসমূহ আছে বলে উল্লেখ করেন।[১৭] অন্যদিকে দেখা যায় বুদ্ধ যখন সুধম্মপুরে যান তখন তাঁর দর্শনপ্রার্থী ৬ জন তাপসকেও পূজার নিমিত্তে ছয়খানি কেশধাতু প্রদান করেন বলে 'শাসন বংশ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এভাবে মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় গৌতম বুদ্ধের যাতায়াত ও ধর্ম প্রচারের ইতিহাস বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদির মাধ্যমে জানা যায়।

অন্যদিকে বৌদ্ধ কানুনিক গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্যানুযায়ী দেখা যায় বুদ্ধের প্রচার জীবনের বর্ণনাক্রমিক অবস্থান লিপি এসব গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও সে তালিকায় বঙ্গের নাম নেই। কানুনিক গ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে' উল্লেখিত বুদ্ধের সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের[১৮] অনেকগুলিই ছিল মহামানব বুদ্ধের বিচরণ ক্ষেত্র। এই ষোড়শ মহাজনপদে বঙ্গের কোনো নামোল্লেখ নেই। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ সালে বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর তাঁর পবিত্র দেহধাতুর আট দাবিদার[১৯] আটভাগে বিভক্ত করে নেন। পরবর্তীকালে এ নামের তালিকায় গান্ধার ও কলিঙ্গ যুক্ত হয়ে নামের তালিকায় সংখ্যা হয় দশ। এই দশটি নামের তালিকায় বা অস্থি ও দন্তধাতুর দাবিদারের মধ্যে কোনো বাঙালির বা বঙ্গের কোনো নাম নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে বুদ্ধের পবিত্র অস্থি বা দন্তধাতুর কোনো দাবিদার ছিলেন না। ইতিহাসশ্রয়ী সিংহলী গ্রন্থ 'মহাবংশ'-এ ও উপমহাদেশের থেরবাদী বৌদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নেই। কারণ স্বরূপ এতে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজা দুটঠগামিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাস্তুতপ বিহারের উৎসর্গকালে বাংলা থেকে কোনো প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হয় নি বা সে অনুষ্ঠানে কোনো বঙ্গবাসী যোগ দেন নি।[২০] এসব তথ্যের দ্বারা ধারণা করা হয়, বুদ্ধ সমসাময়িককালে বা তারও পরে বুদ্ধের বাণী এদেশবাসীর কাছে পৌঁছায়নি। বুদ্ধ

নির্বানের দিনে নিজেই বলেছিলেন , "বাংলার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।"[২১] সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিতকালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু বাংলা দেশ থেকে অন্য দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকও গিয়েছিলেন।

তখন বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া ও উত্তরাঞ্চল নিয়ে), সমতট (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলকে নিয়ে) ও কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমাঞ্চলকে নিয়ে) –এই তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন মগধ ও বঙ্গদেশের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাত্রা এবং মান প্রায় একই রূপ। হয়ত এমনও হতে পারে, প্রাচীনকালে মগধ ও বঙ্গ একই রাষ্ট্র শাসনের অধীনে ছিল এবং সে কারণেই রাজধানী মগধের নাম করে ষোড়শ মহাজনপদে বুদ্ধের পূতাস্থি বা দন্তধাতুর দাবিদারদের মধ্যে অথবা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের স্থান তালিকায় পৃথকভাবে প্রাচীন বঙ্গের নাম বৌদ্ধ কানুনিক গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত হয় নি। এছাড়াও বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বুদ্ধ সমকালীন প্রাচীন মগধের সীমানা পাওয়া যায়—পূর্বে চম্পা নদী, দক্ষিণে বৃন্দাবন পর্বতমালা, পশ্চিমে সোন নদী এবং উত্তরে গঙ্গা নদী।[২২] এটাই যদি প্রাচীন মগধের ভৌগোলিক সীমানা হয় তবে অনুমান করা হয় যে বুদ্ধ সমসাময়িককালেও বঙ্গের কিছু অংশ মগধের অধীন ছিল। প্রাচীনকাল থেকে মগধ ও বঙ্গ একই রাষ্ট্রশাসনের অধীনে ছিল বলে ধারণা করার কারণ হল—১৭৫৭ সালে ভারতে ইংরেজ শাসনারম্ভের পূর্বে ও বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। অষ্টাদশ শতকেও যদি এই মগধ ও বঙ্গ একই রাষ্ট্রশাসন বা রাজ্যের অধীনে থাকতে পারে—তখন বুদ্ধ বা তৎপরবর্তীকালেও মগধ এবং বঙ্গ একই রাষ্ট্রশাসনের অধীনে থাকা অসম্ভব নয়। জনগণের প্রকৃতি, বাংলা ভাষার গঠন ও বিন্যসা, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি একাধিক উপাদানের উপর নির্ভর করে দীনেশ চন্দ্র সেন মত প্রকাশ করেছেন, বুদ্ধ, চৈতন্য, পার্শ্বনাথ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ নরদেবতাদের পায়ের পরশে ধন্য; বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রমুখ সিংহ পুরুষদের কীর্তিভূমি; ধীমান, বীতপাল, বসন্তপাল স্থিরপাল প্রমুখ কীর্তিমান শিল্পীদের শিল্প ঐশ্বর্যে সুসমৃদ্ধ, জগদ্বিখ্যাত মসলিনের

জন্মভূমি এ মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বঙ্গ।[২৩] এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীলঙ্কার 'দ্বীপবংশ' ও 'মহাবংশে'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বুদ্ধের ধর্ম যে সব স্থানকে কেন্দ্র করে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলার অবস্থান অতি নিকটে। একমাত্র এ কারণেই ধারণা করা হয় বুদ্ধের জীবতাবস্থায় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[২৪] এপ্রসঙ্গে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর অভিমতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঙর মতে মহামানব বুদ্ধ বৃহৎ বঙ্গের শেষ সীমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রগুলির মধ্যে মগধ ছিল অন্যতম। মগধ ও বঙ্গ এই উভয় রাজ্যই পাশাপাশি অবস্থিত। সে সূত্রে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূল প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।[২৫]

তাছাড়া বাংলার প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধের যাতায়াত ও ধর্মপ্রচার যদি হয়ে থাকে, বুদ্ধের জন্মস্থান ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রভূমি মগধ হতে অতি নিকটবর্তী বাংলার মাটিতে বুদ্ধের যাতায়াত কেন হবে না—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার এ বুদ্ধের বোধিলাভের ৭ম সপ্তাহের পরই বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সেখানকার বুদ্ধশাসন সংক্রান্ত গ্রন্থ শাসনবংশ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে[২৬] হংসাবতী, মুত্তিমা ও সুবর্ণভূমি নিয়েই রামঞ্ঞ রাজ্য গঠিত ছিল। বর্তমান মায়ানমার প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণভূমি।[২৭]

শাসনবংশ গ্রন্থে আরও উল্লেখ রয়েছে যে থের গবম্পতির "দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া রামঞ্ঞ রাজ্যে সুধম্মপুর নগর নির্মাণ করিলেন। সিংহরাজ নামকরণ করিয়া তাঁহাকে তথায় রাজ্যাভিষেক করিলেন।" স্মরণীয় যে 'সিংহরাজের' পূর্ব নাম ছিল সিরিমালোক।[২৮] উক্ত আলচনার আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ পার্শ্বেই মায়ানমার। সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মগধ থেকে বাংলাদেশের যাতায়াতের সুবিধা মায়ানমারের থেকে অনেক বেশি ছিল। মায়ানমারে যদি সে সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়ে থাকে, তবে বাংলাতেও সে সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়ে থাকবে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। সে সময় বাংলার উপর দিয়েই মগধ থেকে মায়ানমারে যাতায়াত করা ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। সেজন্য নলিনীনাথ দাশগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন, "মগধ ও বাংলা এই দুই দেশের

ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, বুদ্ধের জীবিত কালেই মগধ হইতে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ আসিয়া বাংলাকে প্লাবিত করিয়া দেওয়াটা অসম্ভব বা বিচিত্র কিছুই নয়, কিন্তু তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কই?"[২৯]

গৌতম বুদ্ধ বাংলা আগমন করেছেন বলে কোনো প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বা কোনো শিলা লিপিতে উল্লেখ নেই। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রণীত পালিগ্রন্থ ও ইতিহাসশ্রয়ী সমসাময়িক ঘটনাবলীরত সূত্র ধরে, পারিপার্শ্বিকতার আলোকে বুদ্ধ যে বাংলার মাটিতেও আগমন করে ধর্মপ্রচার করেছেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে 'কজঙ্গলা' সূত্র পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ এক সময় কজঙ্গলা পরিভ্রমণে আসেন। সেখানকার 'সুবেসু' বনে কিছুকাল অবস্থান করেন।[৩০] এ কজঙ্গলা প্রাচীন অঙ্গ, উত্তর রাঢ় ও গৌড়ের মধ্যবর্তী রাজমহলেরর পার্শ্ববর্তী গ্রাম। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে কজঙ্গলা প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গের একটি রাজ্য ছিল।[৩১] বর্তমান 'কাকজোল' গ্রামই উক্ত কজঙ্গলা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধ স্বয়ং বাংলায় এসেছিলেন। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বুদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সেতক নগরে কিছু অবস্থান করেছিলেন। তেলপত্ত (তৈলপত্র) জাতক সাক্ষ্য দেয়, সুম্ভের অন্তর্গত দেসক নগরে বুদ্ধ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।[৩২] রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের সুহ্ম দেশেই এই সেতক নগর অবস্থিত।[৩৩] বর্তমান পণ্ডিতেরা বলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন দক্ষিণ রাঢ়ই হচ্ছে সেতক।[৩৪] অঙ্গুত্তর নিকায়ের মাধ্যমে বঙ্গান্ত পুত্ত উপসেন নামক এক বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায়। অন্যদিকে অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্ত নিকায়, থেরগাথা ও অপাদান গ্রন্থে জানা যায় বুদ্ধের আশিজন সাক্ষাৎ মহাশ্রাবকদের মধ্যে অতুলনীয় কবিত্বের অধিকারী 'বঙ্গীস' ছিলেন অন্যতম। তাঁরা উভয়ে বাংলাদেশের অধিবাসী বলে এরূপ নামধারী হয়েছিলেন।[৩৫] বঙ্গীস ছিলেন একজন স্বভাব কবি। এই প্রতিভাধর কবি প্রায়শ বুদ্ধের সামনে স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে বুদ্ধকে বন্দনা জানাতেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি আত্মপরিচয় দিচ্ছেন এভাবে,

বঙ্গে জাতোতি বঙ্গীসো বচনে ইসসরোতি'চ
বঙ্গীসো ইতিমে নামং অভবিলোক সম্মতং।[৩৬]

"আমি যৌবনে পান্ডিত্য অর্জন করিয়া রাজগৃহে যাই। তথায় সারিপুত্রের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দেন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে সন্যাসদীক্ষা প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে বুদ্ধ সমীপে নিয়ে গেলেন। তথায় দীক্ষা লাভের পর কবিতা রচনা করিয়া আমি সুগতের স্তুতি করতে থাকি। ইহাতে সব্রহ্মচারীগণ কবি চিত্ত বলে আমাকে উপহাস করিতে লাগিলেন।"[৩৭]

থেরগাথা গ্রন্থে স্থবির বঙ্গীসকে শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকূলে উৎপন্ন হলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] বঙ্গীস 'মৃতশিরমন্ত্র' শিক্ষা করে মৃত মস্তকে নখাঘাত করে মৃতব্যক্তি কোন যোনিতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তা বলতে পারতেন। আরও উল্লেখ আছে যে এ নিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বেড়াতেন। শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণকারী হলে তাঁর 'বঙ্গীস' নামকরণ হওয়ার কথা নয়। শ্রাবস্তীতে গিয়ে 'বঙ্গীস' গৌতমবুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং সেখানে অবস্থান করেছিলেন বলে হয়ত তাঁকে শ্রাবস্তীর লোক মনে করা হয়েছে। তবে যেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন না কেন বাংলার সাথে তাঁর যে সম্পৃক্ততা ছিল –তা এ ধরনের নামকরণ থেকে অনুমান করা যায়।

কালিক নামে তাম্রলিপির আরেক ভিক্ষু ষোড়শ মহাস্থবিরের অন্যতম ছিলেন।[৩৯] অপাদান শতকে[৪০] সাক্ষ্য দেয়—শ্রাবস্তীর বুদ্ধ শিষ্য অনাথ পিণ্ডিকের কন্যা সুমাগধাকে পুণ্ড্রবর্ধনের বৃষভদত্ত নামক জনৈক নিগণ্ঠনাথ পুত্রকে বিয়ে দেন। সুমাগধার শ্বশুরালয়ের সবাই ছিলেন নিগণ্ঠ বা নিগ্রন্থ (উলঙ্গ জৈন সন্যাসী)। তাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুমাগধা ধ্যানে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করে পাঁচশত অরহৎ শিষ্যসহ পুণ্ড্রবর্ধন আগমন করেন এবং সুমাগধার আমন্ত্রণ রক্ষা করে পুণ্ড্রবাসীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদানে কল্পলতাও এ ঘটনা সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়।[৪১] 'দিব্যাবদান গ্রন্থেও একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ধম্মপদটঠকথা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে অনাথপিণ্ডিকের দ্বিতীয় কন্যা সুভদ্রাকে পুণ্ড্রবর্ধনের উগ্রনগরের উগ্র শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। সুভদ্রার আমন্ত্রণে বুদ্ধ ৫০০ অরহৎ ভিক্ষুসহ পুণ্ড্রবর্ধন আগমন করেন এবং অনেককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ একটি পালি গাথা আবৃত্তি করেন।[৪২] এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র দাসের উদ্ধৃতি দিয়ে

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, বুদ্ধ মগভদ্রা বা সুভদ্রা (সম্ভবত সুমাগধার অন্য নাম) নামি এক ভদ্র মহিলার আমন্ত্রণ রক্ষার্থে ইক্ষুবর্ধনে (সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধন) এসেছিলেন।[৪৩] পুণ্ড্রবর্ধন ব্যতীত গৌতম একই উদ্দেশ্যে সমতটে (দক্ষিণ বাংলাদেশ বা কুমিল্লা) ৭ দিন এবং কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ও ৭দিন ধরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন।[৪৪] ধর্মাধার মহাস্থবিরও এক নিবন্ধে বুদ্ধ বাংলায় আগমন করেছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৫]

বগুড়ার ইতিকাহিনীর লেখকের ভাষায়, "চীন দেশীয় পর্যটকের মতে পুণ্ড্রবর্ধনের উপকণ্ঠে (ভাসুবিহার) গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কিছুকাল, কারও কারও মতে ৬ মাস কাল অবস্থান করেছিলেন।"[৪৬] কথিত আছে যেখানে বুদ্ধধর্ম দেশনা ও অবস্থান করেছিলেন সেখানে অশোক নির্মিত স্মারক স্তুপ ও বুদ্ধের পদচিহ্ন আছে বলে অনেকের ধারণা।[৪৭] জনশ্রুতি আছে যে গৌতম বুদ্ধ স্বীয় ঋদ্ধিযোগে (অলৌকিক ক্ষমতা) জম্বুদ্বীপের (বৃহত্তর ভারত) বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণকালে বর্তমান চক্রশালা, হাইদগং ও চট্টগ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ও বাঙালি শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধের যে অপার করুণা ছিল অন্যতম বাঙালি বীর সন্তান বিজয় সিংহের প্রতি বুদ্ধের নির্দেশ এর প্রমাণ। বাংলার ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, "বাংলার বীর সন্তান বিজয় সিংহ বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বেই বুদ্ধের নির্দেশ ক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় শ্রীলঙ্কা (সিংহল) জয় করেন।" একজন বাঙালি বীর সন্তানের দ্বারা শ্রীলঙ্কা জয় হবে যুগপৎ বুদ্ধের ধর্ম প্রচার লাভ করবে বলেই বুদ্ধ বিজয় সিংহের প্রতি এরূপ করুণা প্রদর্শন করেছিলেন। এরূপ যোগসূত্রের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে—বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বুদ্ধের অপ্রমেয় করুণা ছিল। এসব কারণে বুদ্ধের জীবদ্দশায় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[৪৮]

সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাঁচী স্তুপের দক্ষিণ দিকের তোরণটি পুণ্ড্রবর্ধন (পুঞবঢন) বাসী ধর্মদত্তা ও ঋষি নন্দনের অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল বলে এখানকার দুটি শিলালিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি শিলালিপিতে আছে 'ধম্মতায় দান্যং পঞঞবদিনায়'[৪৯] অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনের ধর্মতায় বা ধর্মদত্তার দান এবং অন্য শিলালিপিতে আছে 'ইসিনন্দনস্স দানং'[৫০] অর্থাৎ ঋষিনন্দনের দান। অক্ষরতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও

পণ্ডিত ড. বুলার মত প্রকাশ করেছেন যে এই শিলালিপিদ্বয় খ্রি.পূ. তৃতীয় শতকের শেষ বা দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খ্রি.পূ. তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের বাংলায় দুজন সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সাঁচীর তোরণদ্বয়ের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বা এর স্থায়িত্বের জন্য। কারণ এ শিলালিপি দুটিকে মৌর্য যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বা অস্তিত্বের শিলালিপিগত ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

অশোকোত্তর যুগে বাংলাকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিনয় পিটক সাক্ষ্য দেয়, মধ্যদেশের পূর্বসীমা কজঙ্গল গ্রাম।[৫১] রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, কজঙ্গল রাজমহলের নিকট অবস্থিত ছিল।[৫২] ক্যানিংহাম এস্থানকে রাজমহলের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাকজোল বলে সনাক্ত করেছেন।[৫৩] কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে রচিত বিদ্যাবদান সাক্ষ্য দেয়, মধ্যদেশের পূর্বসীমা পুণ্ড্র খাক নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৫৪] সুধিজনের দৃঢ় বিশ্বাসও পুণ্ড্র খাক্য, পুণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানগড় মূলত একটিই এবং তা বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেই অবস্থিত। এসব তথ্যের উপর নির্ভর করে দৃঢ়ভাবে ধারণা করা হয়—অন্তত এ সময়ের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তৎকালীন বাংলায় বুদ্ধের আগমন বা বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ বিবরণী ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খ্রি.পূ. ৬২৯-৬৪৫) তৎকালীন প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসরণ করে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে[৫৫] লিপিবদ্ধ করেছেন যে, বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য তিন মাসাধিক কাল পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করেছিলেন। এ সমস্ত স্থানে তিনি অশোক স্তুপ ও স্তম্ভ দেখতে পান। কিন্তু বাংলায় বুদ্ধের আগমণ ও অবস্থান সম্পর্কে হিউয়েন সাং কিংবদন্তী আশ্রিত যে সব তথ্য প্রদান করেছেন-তা ইতিহাস সম্মত কিনা তা যাচাই করা যায় না। কারণ পালি পিটক গ্রন্থাবলীতে কোথাও বাংলায় বুদ্ধের আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না।

চট্টগ্রামে (হরিখেল)ও বুদ্ধের আগমন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার সংক্রান্ত কিছু লোককথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় মোগগালীপুত্ত তিস্য থেরোর নেতৃত্বে পাটলীপুত্র নগরীতে তৃতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠানের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক চারদিকে যেসব প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন –তার মধ্যে মগধের উত্তরমূল নিকায়ের সদস্য সোন ও উত্তর সুবর্ণভূমি ও শ্যাম (থাইল্যান্ড) গমনকালে বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রামের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন এবং মধ্য চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামে পক্ষাধিকাল অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এসম্পর্কিত আরও প্রাচীন কিংবদন্তী হলো গৌতম বুদ্ধ মায়ানমার গমন কালে কিছুকাল এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং সেই প্রাচীন মন্দিটির পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত স্বর্ণরেখা নদীর জলে স্নান করেছিলেন।[৫৬] এখানে প্রাচীন আমলের স্মারক মন্দির আছে। উপরোক্ত ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও স্থানটি বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য হয়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে উত্তরাপথ থেকে রাজা নরেন্দ্রগুপ্ত-শশাঙ্ক বাংলায় সে পৌঁছান। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ –বিষী। তিনি বেশ কিছু ক্ষিতসাধন করলেও এই ধর্মকে সমূলে বিনষ্ট করতে পারেন নি। পরব্রতীকালে খড়্গ বংশীয় রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় আবার সজীব হয়ে ওঠে। এই রাজারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তাঁদের প্রভাবে সেই সময় মহাযানী বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে। খড়্গ বংশীয় রাজা দেব-খড়্গের পত্নী প্রভাবতী দেবী একসময় বাংলায় একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চন্দ্র বংশের রাজারাও ছিলেন বুদ্ধের অনুরাহগী। তঁদের সময় হরিখেল ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের কেন্দ্রস্থল বিশেষ। কম্বোজ রাজবংশ বহিরাগত হলেও ছিল বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী। এই সব রাজাদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ছিল।

খ্রি. অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজারা বাংলায় এলেন। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ ভক্ত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মানলেও পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের সেবক ছিলেন। পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ইত্যাদি করলেও বৌদ্ধদের

প্রতিদানেও তাঁরা কার্পণ্য করতেন না। অদন্তপুরী, সোমাপুরী, বিক্রমশীলা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় এই বংশের রাজা মহীপাল ও জয়পালের মহান কীর্তি। পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল বাংলায় পঞ্চাশটি বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে ত্রৈকূটক বিহার (রাঢ়ে), পণ্ডিত বিহার (চট্টগ্রামে), সন্নগর বিহার (ত্রিপুরায়), পট্টিকেরক বিহার (ময়নামতী পাহাড়ে), দেবীকোট বিহার (দিনাজপুরে), ফুল্লহরি বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ও জগদ্দল বিহার (বরেন্দ্রীতে) সম্বন্ধে তিব্বতী সাহিত্যে উল্লেখ আছে। এই সব বিহার ছারাও পাল রাজারা বেশ কিছু ছোট বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন কৃষ্ণোনগরে ছিল সুবর্ণবিহার, পূর্ববঙ্গে ছিল কনকস্তূপ বিহার, বগুরায় ছিল বগুড়া বিহার, পাহাড়পুরে ছিল পাহাড়পুর বিহার, আর বালাণ্ডায় ছিল বালাণ্ডা বিহার। এইসব বৌদ্ধ বিহারগুলোয় ছিল অসংখ্য জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা। যেমন আচার্য অদ্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা, ভিক্ষু বিপুলশ্রী মিত্র, করুণাশ্রী মিত্র, বিনয়শ্রী মিত্র, আচার্য বোধিভদ্র, বনরত্ন, নাড়পাদ, তৈলপাদ প্রভৃতি। আর মহাবিহারগুলোতে ছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত, শান্তিগর্ভ, পদ্মসম্ভব, ধর্মকীর্তি, অতীশপ দীপঙ্কর ও কমলাসিলা। এইসব বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভারতের বাইরে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। অতীশ দীপঙ্কর পাল যুগে তিব্বতে গিয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। আদি বাংলা ভাষায় রচিত ‘চর্যাগীতি কোষ’ ও এই যুগে প্রকাশ পায়।

বাংলার বৌদ্ধ পন্ডিতদের কাছে দর্শনশাস্ত্র শিখতে সেই সময় বহুদেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতরা আসতেন। কাশ্মীর, তিব্বত, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতরা বঙ্গভূমিতে এসে ভীড় করতেন বঙ্গভূমিতে।

পাল রাজাদের আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল। পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্য রাজকুমারীদের বিয়ে করতেন, মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন, শ্রাদ্ধানুষথানে ব্রাহ্মণদের দান করতেন ও ব্রাহ্মণয় সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করতেন। অথচ এঁরাই আবার বৌদ্ধ বহার নির্মানো করতেন, ভিক্ষুদের পৃষ্ঠপষকতা করতেন ও বৌদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজাদের এইরূপ সমদৃষ্টির কারণে কোন ধর্মের প্রতি কারো কনরূপ বিরূপতা ছিল না। এইরকম ধর্মীয় সংহতি সেযুগে

অন্যকোথাও দেখা যায় নি। এই সংহতির কারণে বৌদ্ধরা বুদ্ধের মূর্তি পূজার সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য শ্রদ্ধানুষ্ঠান, দক্ষিণা প্রদান প্রভৃতি বৌদ্ধদের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। শিবপূজা, ব্রত পালু, গঙ্গাপূজা, ভিত পূজা, লক্ষ্মী পূজা, প্রভৃতিও বাংলার বৌদ্ধরা শুরু করে দিয়েছিল। আবার মহাযানী বৌদ্ধদের দেব-দেবি পূজা, বৌদ্ধ পার্বনইত্যাদিও সেই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করে। জাঙ্গুলীপূজা, হারিতি পূজা, ধর্মঠাকুর পূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা শুরু করেন।

ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ দেশের কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটাতে তার বিরুদ্ধাচরণ করে নব্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার শুরু করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক দর্শনাচার্য্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউ বৌদ্ধ ধর্মকেরক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। অনেকে বলেন মহাযানী আদর্শের উদ্ভবের জন্য বৌদ্ধ দর্শন তার স্বকীয়তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল। মহাযানী 'শূন্যবাদ' তত্ত্বের উদ্ভবে প্রকৃত ধর্মদর্শন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শঙ্করাচার্য ও কুমারিলভট্ট যেটা করেছিলেন সেটা অনেকটা মহাযানী ধর্মের আদর্শেরই কথা। সুতরাং এঁদেরকে বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ মহাযানী আদর্শেরই বিরুদ্ধে যাওয়া। এক্ষেত্রে হীনযানী সম্প্রদায়রা নিশ্চুপ ছিলেন।

পালবংশের পর সেন বংশের আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পতিপত্তি বাড়তে তাহকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতিই তাঁদের কৃপা প্রদর্শিত হতে তাহকে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘকে তাঁরা কনরূপ বদান্যতা দেখান নি। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারান্থ বলেছেন, 'পাল যুগের শেষে বাংলা দেসে বৌদ্ধ ধর্মের দুরবস্থা দেখা দেয়। পাল যুগে তৈরি বহু বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ মন্দির ভগ্নপ্রায় ও ভগ্ন, অথবা বিধর্মীদের দ্বারা অধ্যুষিত।' এই সময় থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছিল। পরবর্তীতে বর্মন রাজারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা ছিলেন কলিঙ্গের অধিবাসী ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। বর্মন রাজবংশের রাজা জাতবর্মা সোমাপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারটিও পুড়িয়ে দেন। বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহারও ভেঙ্গে পড়ে। ভিক্ষুরা বিহার ছেড়ে বনে আত্মগোপন করেন।

এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বখ্‌তিয়ার খিলজী বিহার প্রদেশে আক্রমন করে নালান্দা বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। ওদন্তপুরী আর বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহারও তিনি ধ্বংস করেন। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করে ও পুঁথিপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেন। কাশ্মিরী বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য শাক্যশ্রীভদ্র ও এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের কথা বলেছেন। তিনি মগধ থেকে পালিয়ে জগদ্দল বিহারে আশ্রয়ও নেন। এই ঘটনার এক বছর পর বখতিয়ার খিলজী বিহার-শরিফ হয়ে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে নদীইয়া আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করেন। অনেকে নদীয়া ছেড়ে পূর্ববঙ্গে ও কামরূপে পালিয়ে যান। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণরা দেশ পরিত্যাগ করেন। নবদ্বীপ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। এককথায় বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলা দখল করে বৌদ্ধ বিহারগুলো নির্বিচারে লুঠ ও ধংস করেন। অসংখ্য বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রাণ হারান। বৌদ্ধদের বাসস্থান জ্বালিয়ে দেয় এই হানাদাররা। বহু নিরীহ বৌদ্ধ প্রাণ বিসর্জন দেন। সমগ্র বঙ্গভূমি বধ্যভূমিতে পরিণত হল। প্রাণ বাঁচাতে বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এইভাবে বাংলায় ইসলাম ধর্মের গোড়াপত্তন শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ ম্লান হতে থাকে।

গৌতম বুদ্ধের দীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারকালে বাংলাতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ঐতিহাসিক, গবেষক ও পণ্ডিতগণ একমত নন। তবে বাংলার ঢাকা জেলার ধামরাই ও শাখাসর অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত স্তম্ভ ও লিপি, ১৯৩১ সনে মহাস্থান গড়ে আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের শিলালিপি ও কাল নির্দেশক বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ইত্যাদির দ্বারা নিশ্চিত অনুমান করা যায়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় না হলেও অন্তত মৌর্য যুগে বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৫৭] বুদ্ধ বা প্রাক অশোক যুগে বুদ্ধের বাণী লিপিবদ্ধ বা ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অশোকের সময় থেকে প্রথম পাথুরে প্রমাণের ধারা প্রবর্তন করা হয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের সাক্ষী হিসেবে মহাস্থানগড়ের মৌর্য যুগের পাথুরে প্রমাণকে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেন।

বাংলায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তন

বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর রাজগৃহে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রথম ধর্ম মহাসম্মেলন করেন। সম্রাট অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই ধর্ম মহাসম্মেলনে নিকায় গ্রন্থগুলো সংকলিত হয়। নিকায় গ্রন্থগুলোতে কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নেই যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। তবে চীনা পরিব্রাজক হিউ-ইয়েন-সাঙ এর ভ্রমণো বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে ধর্মপ্রচার করেছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। বাংলায় বৌদ্ধধুরমের উল্লেখ রয়েছে ভারতবর্ষের খ্রী.পূ. ৪র্থ থেকে২য় শতাব্দীর ইতিহাসে। অর্থাৎ নন্দ ও মৌর্যদের রাজত্বকালে। এই সময় বাংলার রাজারা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁরা সমগ্র বাংলায় নিজেদের ধুরম অনুসারে, এই দুই ধর্মের প্রচারে নেমেছিলেন। তবে এই দুই ধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মও তখন ছিল বঙ্গভূমিতে।

বৌদ্ধ সম্মেলন ও বিভাজন

বুদ্ধের সময়েই ভিক্ষুসংঘে নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সেটা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য আনুমানিক খ্রি.পূ. ৪৮৩ অব্দে প্রথম ধর্ম মহাসেম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বুদ্ধের 'বিনয়' ও 'সূত্রগুলোকে' সংকলিত করা হয়। কিন্তু অনেক ভিক্ষু এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মুল ভিক্ষুসংঘ থেকে সরে যান। এই সম্মেলনে সংকলিত বুদ্ধের বিনয় ও ধর্মকে যারা মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা **'স্থবিরবাদী' বা 'থেরবাদী'** নামে পরিচিতি লাভ করলেন। সুতরাং বলা যায় এই সম্মেলনে ভিক্ষুদের অনৈক্য দূরীভূত হয় নি।[৫৮]

প্রথম সম্মেলনের ঠিক একশ বছর পর খ্রি.পূ. ৩৮৩ অব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন বিচ্ছেদবাদী ভিক্ষুদের নানারূপ আপত্তিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সম্মেলনের সেশে প্রায় দশ হাজার ভিক্ষুদের ভিক্ষুসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বিদ্রোহী ভিক্ষুরা বৈশালীর আর একটি অঞ্চলে নিজেদের নিয়ে অধিবেশন করে। তাঁরা বুদ্ধের নিতি ও আদর্শের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটায়। এঁরা **'মহাসাঙ্ঘিক'**

ভিক্ষুগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হন। সুতরাং একশ বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, স্থবিরবাদী বা থেরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক। মহাসাঙ্ঘিকরাবুদ্ধের ধর্ম ও নীতি থেকে বহু দূরে সরে যাওন। আর স্থবিরবাদীরা বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ ধরে রইলেন। কিন্তু তাঁরাও বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে বেশি দিন থাকতে পারলেন না। ক্রমে এই স্থবিরবাদ থেকে বেরিয়ে এলো **'মহিশাসক', 'সর্বাস্তিবাদী', 'সম্মিতীয়' ও 'সৌত্রান্তিক'** ভিক্ষু গোষ্ঠীসহ সর্বমোট এগারোটি গোষ্ঠীর। মহাসাঙ্ঘিকরাও **'লোকোত্তরবাদী'** ভিক্ষু গোষ্ঠীসহ সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৫৯]

খ্রি.পূ. ২৪৭ অব্দে মৌর্য সম্রাত অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। তিনি ছিলেন থেরবাদী বৌদ্ধ। কিন্তু তিনিও ভিক্ষুসঙ্ঘে ঐক্যস্থাপন করতে পারেন নি। এই সম্মেলনের পর থেরবাদী মতাদর্শ ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁ স্থান অধিকার করেছিল মহাসাঙ্ঘইকরা। তাঁদের উদার-নীতি, পূজা, দান, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি মতাবাদ সাধারণ জনমানসে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিও এইসময় মহাসাঙ্ঘিকদের ছত্রছায়ায় চলে আসে। এই মহাসানঙ্ঘহিকরাই চতুর্থ ধর্ম মহাসম্মেলনে (কণিষ্কের সময় খ্রি.১ম শতকে) নিজেদের **'মহাযানী'** বলে অভিহিত করল। আর স্থবিরবাদীরা হল **'হীনযানী'** সম্প্রদায়।

হীনযানীরা প্রাচীন আদর্শকে আঁকড়ে থাকেন। তারা বুদ্ধের নীতি, আদর্শ মেনে চলল। কিন্তু মহাযানীরা তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। তারা বুদ্ধকে লোকোত্তর বলে গ্রহণ করে তাঁর উপর অলৌকিকতা আরোপ করছিলেন। তারা অসংখ্য বুদ্ধ, দেবতা, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির সংযোজন ঘটান এই ধর্মের মধ্যে। পূজা, অর্চনা, নানা ক্রিয়া-কাণ্ড তারা বৌদ্ধধর্মে অন্তর্ভুক্তি করেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মে নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে খ্রি. ১ম শতকের পর মহাযানী ধর্মবিশ্বাস বাংলায় প্রবেশ করে। তারাই বাংলায় বুদ্ধ পূজার উদ্ভব করে। নানা দেব-দেবীর পূজার উদ্ভবও করে তারা। এইভাবে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে হীনযানীদের সাথে মহাযানীদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ দুরকম বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব তখন বঙ্গভূমিতে লক্ষ করা যায়।

মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল। তার উল্লেখ রয়েছে চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ও বৌদ্দ 'দিব্যবদান' গ্রন্থে। চীনা পরিব্রাজক হিউ-ইয়েন-সাঙ সম্রাট অশোকের তৈরি কিছু স্তুপ দেখেছিলেন কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ততে। খ্রি.পূ. ২য় শতাব্দীতে বাংলার দুই বৌদ্ধ অধিবাসী ঋষি নন্দন ও শ্রীমতি ধর্মদতা, সাঁচির বিখায়ত বৌদ্ধ স্তুপের বেষ্টনী ও তোরণ তৈরির জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ততে প্রায় দুবছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনিও সেই সময় তাম্রলিপ্ততে বহু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।খ্রি.পূ. তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক বাংলায় প্রায় সত্তরটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। পুণ্ড্রবর্ধনে প্রায় কুড়িটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনাএ হীনযানী ও মহাযানী সম্প্রদায় মিলিয়ে প্রায় তিনহাজারেরো বেশী ভিক্ষু ছিলেন। সমতটে ছিল ত্রিশটি বৌদ্ধ বহার। যার বেশিরভাগ ছিল মহাযানী ভিক্ষুদের। কর্ণসুবর্ণে ছিল দশাধিক বৌদ্ধ বিহার। এখানেও ছিল মহাযানীদের প্রভাব। তাম্রলিপ্ততেই প্রায় বাইশটি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া ভিক্ষুনীরাও থাকত এই সব বিহারে। এখানেও মহাযানীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কজঙ্গলেও প্রচুর বৌদ্ধ বিহার দেখা যায়, যেখানে মহাযানীদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে বাংলার স্থানীয় অধিবাসী ভিক্ষুরা ছিলেন হীনযানী সম্প্রদায়ের।

বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিকতা

মন্ত্র, তুকতাক, বশীকরণ ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল অথর্ববেদের আমলে। অথর্ব বেদের মানুষ দেবতার মুখাপেক্ষি না হয়ে নিজেই মন্ত্রশক্তির বলে ইচ্ছাপূরণে সচেষ্ট হয়েছিল। দেবতার নামে যজ্ঞ করলে দেবতা তুষ্ট হয়ে যজ্ঞকারীর অভিষ্ট সিদ্ধি করবে, এটা আদিকালে মানুষ বিশ্বাসও করলেও, পরবর্তীকালে মানুষ সম্পূর্ণ দেবতা নির্ভর না হয়ে নিজেই তার অভিষ্ট সদ্ধির জন্য মন্ত্র, বশীকরণো, তুকতাক ইত্যাদির উদ্ভব করল। নিজের শক্তি দ্বারা বহির্শক্তিকে জয় করাই ছিল উদ্দেশ্য। সাধনার দ্বারা শক্তি অর্জন করে নিজের ভাল বা অন্যের মন্দ করাই ছিল মন্ত্রশক্তি উদ্ভবের মূলে। অথর্ববেদে এই রূপ সাধনার নিয়মাবলীরও উল্লেখ আছে। সুতরাং তুকতাক, বশীকরণ, মন্ত্রশক্তি, প্রাচীনকালে থেকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে জড়িত ছিল। লোকসমাজে প্রচলিত এইসমস্ত বিশ্বাস

মহাযানী সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে। প্রাচীন বৃক্ষ পূজা, লিঙ্গ-যোনি পূজা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী, দিকপাল ইত্যাদির পূজা, হারিতি পূজা, জাঙ্গুলি পূজা প্রভৃতি মহাযানী ধর্মে স্থান পেল। এই সব পূজা, যাদু, টোনা, তুকতাক ইত্যাদি নিজেদের আত্মরক্ষার কবচ হিসেবে ধর্মে প্রাধান্য পেল।[৬০]

মহাযানী ভিক্ষুরা বহু পূর্ব থেকে অলূকিক শক্তি লাভের আশায় গোপনে তন্ত্র সাধনা করতেন। এই সব ভিক্ষুরা গোপনে 'গুহ্যসমাজ' নামে নিজেদের দলও গড়লেন। খ্রি. প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে মহাযানী বৌদ্ধরা 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামে তন্ত্র সাধনার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের অনুকরণে 'গুহ্য সমাজ' খ্রি. তৃতীয় শতকে 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' নামে তন্ত্রের আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রি. তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে আচার্য ভিক্ষু অসঙ্গ 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' গ্রন্থের অনুকরণে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' নামক তন্ত্র সাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং বলা যায়, খ্রি. প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই বাংলার প্রথম তন্ত্র সাধনার উদ্ভব করেন মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই। তবে এর বিকাশ ঘটে খ্রি. তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে।[৬১]

মহাযানীদের মধ্যে তখন তন্ত্র সাধনা ছিল বলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রাচীন প্রথাগুলোকে তাঁরা উপেক্ষা করেননি। সেগুলো তাঁরা ধর্মে গ্রহণ করলেন সেই সকল মানুষদের বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য। তন্ত্র সাধনাকেই জোরদার করলেন মহাযানীরা।

নাগার্জুনের 'শূন্যবাদের' সহজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাযানী পন্ডিত ভিক্ষুরা বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনা বৌদ্ধ ধ্যানতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করলেন (খ্রি. সপ্তম শতকে)। সাধারণ মানুষ শূন্যবাদের তত্ত্বকথা ও ধ্যানের বিভিন্ন স্তরগুলো সহজে বুঝতে পারেলেন না। তাদের কাছে ধ্যানের চাইতে মন্ত্রই হলো মূল প্রেরণা। তারা যাদুমন্ত্র, ধারণী, বীজ ইত্যাদি সহজে বুঝতেন। মহাযানী পণ্ডিতরা তাই তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের সারবস্তুকে বোঝালেন। ধর্মের গূঢ়তত্ত্বকে তাঁরা তন্ত্রের মাধ্যমে সহজে সকলের বধগম্য করে তুললেন। এইভাবেসপ্তম শতকে বাংলা হয়ে উঠল তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। তিব্বতী সূত্রে উল্লেখ পাই যে খ্রি. সপ্তম স্তকে মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে ধর্মকীর্তির সময়। বাংলাতে এইসময় অনেক তান্ত্রিক আচার্য ছিলেন, যাঁরা বিহারে অবস্থান

করে তন্ত্র সাধনার শিক্ষা দিতেন। বিক্রমপুরের বিহারে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য ভিক্ষু কুমারচন্দ্র। চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারে ছিলেন তন্তাচার্য ভিক্ষু তৈলপাদ। বগুড়া ও কৃষ্ণনগরের বিহার দুটিও ছিল তন্ত্র সাধনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এইসময় প্রায় চুরাশি জন তন্ত্রসিদ্ধাচার্য এই দেশে ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই মহাযানী তন্ত্রসাধনার বিকাশ ঘটেছিল এই দেশ।

মন্ত্রযান ও বজ্রযান

মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তন্ত্রসাধনাকে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে ঢুকিয়ে নিয়ে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে এক নতুন ধ্যান কল্পনা গড়ে তুললেন। মূল প্রেরণা হল 'মন্ত্র' আর তার সাথে যুক্ত হল 'ধারণী' ও 'বীজ'। এই নতুন ধ্যান কল্পনার পথই হলো 'মন্ত্রযান'। **'মন্ত্রযান'** ও **'বজ্রযান'** এই দুই প্রকার তন্ত্রসাধনার উদ্ভব হল মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে।[৬২] আর এই ধ্যান কল্পনার গোড়াপত্তন হল এই বাংলাতে।

মহাযানী ভিক্ষুরা তন্ত্রসাধনাকেই সঠিক ধ্যান পদ্ধতি বলে মনে করলেন। তারা বুদ্ধের বিপস্সনা ধ্যানকে সরিয়ে রাখলেন। আর অন্যদিকে হীনযানীরা বুদ্ধের প্রদর্শিত পথকে আঁকড়ে রইলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র। বাংলাতে মহাযানীরা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মূলত নিম্নবর্ণীয় হাড়ি, শবর, জেলে, মুচি, কুমার, ডোম, মাঝি, চণ্ডাল, পৌণ্ড্র প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের মধ্য দিয়েই মহাযানীরা তাদের নব্য তন্ত্রসাধনার প্রথম বিকাশ ঘটিয়েছিল।

তন্ত্রসাধনা হল এক বিশেষ ধ্যান পদ্ধতি যার দ্বারা সহজে সাধক সিদ্ধিলাভ করে। বুদ্ধের শীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চিত্ত শুদ্ধি, ইত্যাদি কঠিন বিষয়গুলি এই ধ্যানে নিষ্প্রয়োজন। তন্ত্রসাধনার একটি ভাগকে বলা হয় মন্ত্রযান। এইরূপ তন্ত্রসাধনায় সাধক তার মূল বীজমন্ত্র মনে মনে জপ করে ধ্যানে মগ্ন হবে। এই বীজ মন্ত্রই সাধককে শক্তি দেবে। তার মনকে স্থির করবে। তখন সাধক সেই ধ্যানের মধ্যে নানা রঙ, নানা রূপ প্রত্যক্ষ করবে। নানা বীভৎস রূপ তার সামনে ছায়াছবির মতো উদয় হবে। সেই কাল্পনিক রূপকে দেব বা দেবী বলে মেনে নিয়ে তাঁদের ধ্যান করাই হচ্ছে মন্ত্রযান তন্ত্রসাধনার মূল

বিষয়। সেই দেব-দেবীই সাধককে মুক্তির পথ দেখাবেন ও জাগতিক মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন। সংক্ষেপে এই হচ্ছে তন্ত্রসাধনার 'মন্ত্রযান' ধ্যান পদ্ধতি।

এই মন্ত্রযান তন্ত্রে সাধক চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্তরের অগ্নি শক্তিকে কার্যকরি করে। সেই শক্তি মনের ভয়-ভীতি দূর করে সাধককে শক্তিপ্রদান করে মুক্তির পথ ধারায়। এই সাধনার মাধ্যমেই মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে বহু দেব-দেবীর উদ্ভব হয়েছে। যেমন তারা, হারিতি, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী প্রভৃতি দেবী মহাযানীরা মন্ত্রযান ধ্যানের মাধ্যমেই লাভ করেছে। এইভাবে অসংখ্য দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে কল্পনার বাইরে এদের কোন অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয় প্রকার তন্ত্র সাধনাকে বলা হয় 'বজ্রযান' সাধনা। শূন্যবাদীদের কাছে নির্বাণ হচ্ছে শূন্যতার পরম জ্ঞান। নির্বাণ প্রাপ্তি হচ্ছে জীবের পরম সুখ। শূন্যরূপ নির্বাণকে এই তন্ত্র সাধনায় কল্পনা করা হল দেবীরূপে। আর যে চিত্তে বোধিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞানের সংকল্প রয়েছে, তাকে বলা হল'বোধিচিত্ত'। এই বধিচিত্ত ধায়নের মাধ্যমে যখন শূন্যতায় বিলীন হয়, তখনই নিররাবণ বা পরম সুখের উদয়। বলা হয়, বোধিচিত্ত কল্পিত দেবির সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হলেই মহাসুখের উদয় হয়, অর্থাৎ নির্বান লাভ হয়। চিত্তের বজ্রভাবে বোধিজ্ঞান লাভ করা যায়। তাই এই সাধনাকে বলা হয় 'বজ্রযান' তন্ত্র সাধনা।

বজ্রযানীরা বলে, রমণে যে চরম সুখ অনুভব করা যায়, সেই অনুভিতিই হচ্ছে 'বোধিচিত্ত'। এই 'বোধিচিত্তের' জন্য কঠোর যোগসাধনার প্রয়োজন। যোগ সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি দমন করেই তবেই চিত্ত বজ্রের মতো কঠিন। রমণজাত চরম সুখকে স্থাই করা যায় মন্ত্রের সক্তিতে। আর এর মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয় শক্তিকে দমন করা যায়। এই চরম সুখের সময় অর্থাৎ বোধিচিত্ত বজ্র কঠিন হলে, তখন সাধক দেব-দেবী দেখতে পায়। এই সব দেব-দেবীর ধ্যানে ডুবে গেলে বোধিচিত্ত কঠিন হয়ে সাধকের বোধিজ্ঞান লাভ হয়। বজ্রযানেও অসংখ্য দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা, আচার, অনুষ্ঠানে ভরা বজ্রযান সাধন মার্গ। মন্ত্রযানেও এই র‍্যেছে। এই বজ্রযান ও মন্ত্রযান সাধনার কারণেই মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে নানা রকম দেব-দেবীর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই।

পর্যবেক্ষণ

প্রতিবাদী ধর্মস্বরূপ এই ধর্মের আবির্ভাবের পর এই ধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। খুব দ্রুত এই ধর্ম এশিয়ার অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেন আমলের পর এই ধর্মে ফাটল দেখা যায়। পুনরায় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জোয়ার দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাংলা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশের ফলে নানা আঙ্গিকে এই ধর্মের প্রভাব সাধারণ জনমানসে প্রকটিত ছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. অশ্বঘোষ: *বুদ্ধচরিত,* (কলকাতা, করুণা প্রকাশনী,২০১৬), পৃ.১১।

২. *তদেব*।

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: রচনাসংগ্রহ (৩য় খন্ড), (কলিকাতা, ১৯৮৪), পৃ.পৃ. ২৮৫-২৮৮।

৪. *তদেব*, পৃ. ২৮৯।

৫. *তদেব*, পৃ.পৃ. ২৯২-২৯৭।

৬. D.D. Kosambi: *Culture and Civilization oin Ancient Indian in Historical Outline*, (Delhi, 1977), পৃ.পৃ. ৯৭-১০৪।

৭. Romila Thaper: *A History of India*, (London, 1966),পৃ.পৃ. ৫০-৬৮।

৮. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: *ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস,* (কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃ.পৃ. ৩৭-৩৮।

৯. *মহাবগ্গ*-(মূল পালি), পৃ. ২৭।

১০. দ্বারিকা মোহন মুৎসদ্দী-দাঠাবংসো।

১১. ধর্মাধার মহাস্থবির: *শাসন বংশ,* পৃ. ৫৫।

১২. *চে খঁযে অং-দি রাখাইন রিভিউ সংখ্যা-১,* (কক্সবাজার, ১৯৯৪)।

১৩. Ven Condobhasa: *A Brief History of the Great Imager*, (Mahamuni, Mandalay), পৃ. ১।

১৪. ধর্মাধার মহাস্থবির: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১৫. One of the Miracle of the Earth'-Buddhists for Peace. Mogolia, পৃ. ৩।

১৬.মহাবগ্গ-(বঙ্গানুবাদ), পৃ.পৃ.৪-৫।

১৭. U. Tun Aung Chain and U Thein Hlaing (ed): *Shwedagon*, পৃ. ১।

১৮. কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জী, মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, সুরসেন, মৎস, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ।

১৯. মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবীগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, পাবার মল্লগণো, কুশিনগরের মল্লগণো ও বেটদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণ; মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্তং, পৃ. ১৬৭-৭১।

২০. W. Geiger (ed): *Mahavamsa*, (P.T.S. London, 1908), পৃপৃ. ১৯৩-১৯৪।

২১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: *বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম,* (ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ১৬৭।

২২. G.P. Malalasekar: *Dicttionary of Pali Proper Names, Vol. 11*, (Delhi, 1983), পৃ. ৪০৩।

২৩. দীনেশ চন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ (১ম খন্ড), পৃ. ১৫।

২৪. *হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম খন্ড),* (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ.পৃ. ৪১৯-৪২০।

২৫. *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (২য় খন্ড*), (কলিকাতা, ১৩৭১), পৃ.৩০৫।

২৬. *শাসনবংশ*, পৃ.৫৩।

২৭. Suvarnabhumi-The Golden Land (Buddhists for Peace)

২৮. *শাসনবংশ*, পৃ. ৫৪।

২৯. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত: *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম,* পৃ.৩৫।

৩০. 'একং সময়ং ভগবা কজঙ্গলায় বিহরিত সুবেসু বনে'

৩১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস,* পৃ.পৃ. ১-১; ধর্মাধার মহাস্থবির: *মিলিন্দ প্রশ্ন,* পৃ.পৃ. ৮-১১; বৌদ্ধযুগের ভূগোল, পৃ. ১৬।

৩২. Faushall (ed): *Jataka, Vol. 1, No. 96*, (PTS London, 1877), পৃ ৩৯৮।

৩৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৮।

৩৪. ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির: *পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি,* পৃ. ২।

৩৫. Dictionary of Pali Proper Names Vol. II, Ibid, পৃ. ৮০৩।

৩৬. *সংযুক্ত নিকায় ও থের গাথা* (মূল পালি), পৃ. ২০৫, পৃ. ২৬৪ ও পৃ. ৫২৭।

৩৭. *থেরগাথা*, পৃ. ৫২৭।

৩৮. *তদেব,* পৃ. ৫৪১।

৩৯. ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

৪০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

৪১. শরৎ চন্দ্র দাশ (অনুদিত): *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (২য় খন্ড)*, (কলিকাতা, ১৩৮৮), পৃ.পৃ.২৬৫-৭১।

৪২. "দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমাবন্তোব পববতো, অসসেথ দিসমন্তি রতিখিত্তা যথাসরা"—ধম্মপদ শ্লোক নং ৩০৪।

৪৩. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

৪৪. *তদেব*, পৃ.৩৪।

৪৫. জিনবংশ স্মরণিকা: *চট্টলে মগধ সংস্কৃতি* (প্রবন্ধ), ১৯৯৪, পৃ. ১২।

৪৬. কে.এম. মিহির: *বগুড়ার ইতিকাহিনী* , পৃ. ৪৪৮।

৪৭. ড. নাজিমুদ্দিন: *মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর*, পৃ. ৪২।

৪৮. ধর্মরক্ষিত মহাথের: *বুদ্ধ ও মৌর্য যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*, পৃ.২৫।

৪৯. Epigraphia of Indica, Vol.11, No. 102, পৃ.১০৮।

৫০. *Epigraphia of Indica, Vol.11, No. 217*, পৃ.৩৮০।

৫১. *Vinaya Pitakam, Vol-1,* (P.T.S. London 1969), পৃ.১৬৭।

৫২. *History of Bengal*, পৃ.৪১১।

৫৩. Geography of Ancient India, (Calcutta, 1924); B.N. Chowdhury : *Buddhists Cemntres in Ancient India*, (Calcutta, 1969).

৫৪. *Divyavadan, Vol-1,* পৃ.২১; B.C. Law: *Geography of Early Buddhism*, (Delhi, 1973),পৃ.পৃ. ১-২।

৫৫. S.Beal: The Life of Hiuen Tiang, (Delhi, 1973), পৃ.পৃ.১৩১-৩৩;.....: *Buddhist Records of the Western World,* (Delhi, 1981), পৃ.পৃ. ৯৪-২০৪।

৫৬. ভিক্ষু সুনীথানন্দ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।।

৫৭. *তদেব*, পৃ.২৭।

৫৮. সাধনকমল চৌধুরী: *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন,* (কলকাতা, করুণা প্রিন্টার্স, ২০০২), পৃ. পৃ. ৩-৫।।

৫৯. *তদেব,* পৃ. ১৮।।

৬০. *Studies in Tantras*, (C.U. 1939).

৬১. D. P. Chattopadhaya: *Taraknath's History of Buddhism in India*.

৬২. সাধনকমল চৌধুরী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গবিভাগ রাজনীতি ও জাতীয় সংগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বঙ্গ বিভাগ ও রাজনীতি

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ মূলত আবেদন নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনায় দুটি মত প্রকাশিত হয়েছিল। একটি হল অহিংস আন্দোলন অন্যটি হল সশস্ত্র আন্দোলন। এই সশস্ত্র আন্দোলনকে কেউ কেউ 'সন্ত্রাসবাদ' নামে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনকে কখনও সন্ত্রাসবাদরূপে আখ্যায়িত করা সঙ্গত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) অপ্রতিহত প্রতাপ নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিরাজিত ছিলেন। যিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন ১৯২১ সালে খিলাফৎ আন্দোলনে কংগ্রেসকে যুক্ত করে। ফল হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মৌলবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) গান্ধিজীর এই নীতির বিরোধীতা করেছিলেন।[২] ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ এই সময়কালে, দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, তাঁকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে পরিগণিত করেছিল। ১৯২৪ সালে শেষের দিকে গান্ধীজির সঙ্গে মতিলাল নেহেরু (১৮৬১-১৯৩১) এবং চিত্তরঞ্জন দাসের চুক্তি হয়। গান্ধিজী কংগ্রেস ছেড়ে খাদি আন্দোলনে চলে গেলেন এবং সমগ্র ভারতের সংখ্যালঘুদের পরিপূর্ণ আস্থা চিত্তরঞ্জন দাসের উপর অর্পিত হল। দেশবন্ধু ১৯২৩ সালে কলকাতা কর্পরেশনের মেয়র হলেন এবং সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-) হলেন চিফ একজিকিউটিভ। চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষ চন্দ্র সেদিন বলেছিলেন যে এদেশে যে বিরাট মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মর্যাদা দিতে হবে। তবে দ্বিজাতিতত্ত্বের কাছে মাথা নত করে নয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তা করলেন না। ১৯৪১ সালে যখন Cripps Mission এল তখন নেতাজি বিদেশ থেকে বারবার বলেছেন যে Cripps Mission –এর কাছে যেন কখনই আত্মসমর্পণ না করা হয়।

এইভাবে Cripps Mission ব্যর্থ হল।[৩] ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে দেশজুড়ে আন্দোলন হল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে নেতৃত্ব না দিয়ে কারাগারে চলে গেলেন। নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন চলল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উপলব্ধি করল যে যদি মুসলিম আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে ভাগ করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভব না হলেও পরোক্ষ শাসনের মাধ্যমে শোষণ করা সম্ভব হবে। ১৯৪৪ সালেও নেতাজী বারবার জাতীয় নেতাদের কাছে আবেদন করেছিলেন ভারত ভাগের বিরোধিতা করতে। ১৯২৫ সালের ১৬ ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। ১৯২৯ সালে গান্ধীজী আবার রাজনীতির আঙিনায় পূর্ণরূপে ফিরে এলেন এবং তোষণের নীতি নিয়ে চলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালে নির্বাচনে Conservative Party পরাজিত হল এবং Labour Party ক্ষমতায় এল। তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগস্ট কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হল 'The Great Calcutta Killing'।[৪] হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৫০০০ নিরীহ মানুষ প্রাণ দিলেন, ১০০০০ মানুষ মারাত্মকভাবে জখম হলেন। উভয় সম্প্রদায়ের মানষই ছিলেন। তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের কাছে মাথা নত করে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। মুসলিম প্রধান রাজ্য পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলা, সিলেটসহ আসাম ভাগের কথা উঠল। 'The Great Calcutta Killing' এরপর নোয়াখালীতে হত্যাকাণ্ড শুরু হল। মহাত্মা গান্ধী সেখানে গেলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন বেলেঘাটাতে। সুরাবর্দী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গান্ধীজীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। সুভাষচন্দ্র তখন দেশের বাইরে। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের সমাধান তার আজাদহিন্দ বাহিনীতে করে দিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাইকে সমমর্যাদা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি এক আদর্শ সরকার তৈরি করেছিলেন কিন্তু তা প্রতিফলিত হলো না স্বাধীন ভারতবর্ষে। ১৯৪৬ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন। তিনি প্রস্তাব অনুযায়ী দেশ ভাগ হলো। পাঞ্জাবের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী আকবর খান গান্ধীজীর কাছে এসে বললেন যে দ্বিজাতি তত্ত্বের কাছে মাথা নত করে যেন দেশভাগ না করা হয়। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফর

বললেন "আমাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিও না"।[৫] কিন্তু দেশীয় নেতারা সিংহাসনের লোভে দেশবিভাগ মেনে নিলেন। দেশভাগ হয় হোক। লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দেয় দিক, কিন্তু সিংহাসন চাই দুটি প্রধান দলের প্রবক্তা হলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪)।

দেশভাগের ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলার নিহত নিরীহ মানুষের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। অবিভক্ত বঙ্গের মূল অর্থকারী ফসল ছিল পাট। প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক পাটচাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাটচাষ হত মূলত ওপার বাংলায়, দেশভাগের ফলে যা হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে ৬২ টি পাটকল থেকে যায় এপার বাংলায়। ১৯৫০ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫ লাখ শ্রমিক যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। দেশভাগের ফলে পাটকলগুলোর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী হলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই নৃশংসভাবে নিহত হন। এরপর তার পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০০ কোটি টাকা রুগ্ন পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বরাদ্দ করেন। কিন্তু পাটকল মালিকরা তা আত্মসাৎ করে। এইভাবে এ রাজ্যের পাট শিল্প মার খেল। দেশবিভাগের পূর্বে "বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ" এই মন্ত্রকে সামনে রেখে বাঙালি মালিকানায় বিভিন্ন অস্ত্র কারখানা স্থাপিত হয়েছিল যথা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, অন্নপূর্ণা কটন মিল প্রভৃতি।[৬] দেশ বিভাগের পর প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে না পেরে এইসব কারখানাগুলোও একে একে শেষ হয়ে গেল। এভাবে এরাজ্যে বস্ত্রশিল্প মার খেল। দেশবিভাগের পর প্রায় এক কোটি মানুষ ওপার বাংলা থেকে এ রাজ্যে এসেছে, কিন্তু এ রাজ্যের আয়তন তথা ভূখণ্ড বাড়েনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এ দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সমৃদ্ধ রাজ্যরূপে চিহ্নিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে জন্মহার হল ২.৫% সেখানে এ রাজ্যের কোথাও কোথাও (যেমন বারাসাতে) জন্মহার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১০% এর বেশি। এর মর্মান্তিক পরিণতি রাজ্যবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে।

সেদিন দ্বিজাতি তত্ত্বের কাছে মাথা নত করে যে বীজ দেশীয় নেতারা বপন করেছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭২ বছর পরেও সেই সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভানো যায়নি। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। দেশভাগ আমাদের দেশের অর্থনীতির পক্ষে গুরুতরভাবে ক্ষতিকারক হয়েছে। দেশবিভাগ যদি না ঘটত, তাহলে অবিভক্ত ভারত পাট উৎপাদনে এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে প্রথম স্থানে থাকতো, তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদনে ও রপ্তানিতে প্রথম স্থানে থাকতো- আন্তর্জাতিক বাজারে। হিন্দু মুসলিমের অবিশ্বাসের বাতাবরণে দূর করার জন্য যা করা হল, অর্থাৎ দেশ বিভাগ, তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ ও অশুভ।

বঙ্গ বিভাগ: সামাজিক প্রভাব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার শেষ চেষ্টা করেছিলেন ক্যাবিনেট মিশনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ যেভাবে বন্টিত আছে সেটা কেও না গুরুত্ব দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করলে সেটা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এরপর ক্যাবিনেট মিশন নানানভাবে ফর্মুলা বের করে, আলোচনা করে, সবাইকে সন্তুষ্ট করে একটা পথ বের করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টা ছিল এই যে অখন্ড ভারত স্বাধীনতা পাবে। এই অবস্থায় অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে জিন্না এবং মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এদিকে অনেক টালবাহানার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এটা মেনে নিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের কোন একটা সময় এলাহাবাদের একটা সাংবাদিক সম্মেলনে পন্ডিত জহরলাল নেহেরু বলে বসলেন We will decide our own course of action।[৭] জিন্না তাই ওয়াভেল এর কাছে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এটাই বললেন, এই যদি কংগ্রেসের মনোভাব হয়, তাহলে মুসলিমরা আর নিরাপদ নয়। বক্তব্যটি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল নিঃসন্দেহে। তার উপর জহরলাল নেহেরুর এই মূর্খতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবি আরও সহজ হয়ে দাঁড়ালো। হিন্দু সংখ্যাধিক্যের নেতারা বলেছিলেন যে আগে ব্রিটিশ চলে যাক, তারপর আমরা যা করার করব, যা সিদ্ধান্ত নেবার নেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ভাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে এইরকম পরিস্থিতিতে ব্রিটিশরা দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলতে শুরু করলেন। ৬৭২ অথবা ৬৭৫ টির মতো দেশীয় রাজ্য ছিল ভারতবর্ষে। এগুলির মধ্যে কাশ্মীর আর হায়দ্রাবাদের মত বিরাট রাজ্যও যেমন ছিল তেমনি জুনাগর আর কাথিয়াওয়াড়ের মত অতি ক্ষুদ্র প্রায়-- ছোট বড় গ্রাম বলা যায়-- এমন রাজ্যও ছিল। এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার একটা চুক্তি করেছিলেন সেটা হল Law of Paramountcy। তারা ব্রিটিশ শাসকদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের রাজ্য শাসন করবে। অতএব বড় বড় রাজ্য এবং অনেকগুলি ছোট রাজ্য একত্রিত করে ১১ টা অঞ্চলে ভাগ করে ব্রিটেন তার স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিনিধি রাখত। এদের কাজ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তরফ থেকে obsrver হিসেবে থাকা। কিন্তু দেশীয় রাজারা যেভাবে নিজ নিজ রাজ্যের প্রজাদের শোষণ করতেন, তাতে ব্রিটিশ সরকার কোন রকম আপত্তি করত না।

এর অবশ্য একটা অন্য কারণ ছিল। আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলছি সেটার ছিল দুটো অংশ। একটা ছিল 'ব্রিটিশ ভারত'- যেটা ১৮৫৭ থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিজের দায়িত্ব ছিল। অন্যটা ছিল 'দেশীয় ভারত' যেটার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল এদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষকে চরম সর্বনাশে ঠেলে দেবে তো বটেই, অতএব তারপর ও সেই অবস্থা থেকে লাভ করবে তারা। ব্রিটিশরা ভাবেনি যে, এই ৬৭৫ রাজ্য-কেবলমাত্র কাশ্মীর বাদ দিয়ে বাকি সবাই এক সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে। এর মধ্যে ৬ টার মত রাজ্য গেছে পাকিস্তানে, বাকি সবাই এসেছে ভারতবর্ষে। এর মধ্যে সংখ্যাধিক অংশ এসেছে নিজের ইচ্ছায় এবং কয়েকটি এসেছে উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে, তাঁর উদ্যোগে। এই প্রক্রিয়া না ঘটলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম রাজ্য জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে থাকতো। এমনকি যে আইনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ১৯৪৭, তাতে তো স্পষ্টই বলা ছিল যে ব্রিটিশ ভারতের ক্ষমতা ভাগ হবে দুটি স্ব-শাসিত রাষ্ট্রে- ভারত এবং পাকিস্তানের আর দেশীয়

রাজ্যগুলি ব্রিটিশ শাসনের ক্ষমতা অতিবাহিত হবার ফলে তারাও নিজস্ব ক্ষমতা পেয়ে যাবে এবং স্বাধীন হয়ে যাবে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় বেঙ্গল নিয়ে ভারতবর্ষে তিনটি মতামত ছিল।[৮] প্রথমতঃ দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক যে সাধারণ ফর্মুলা ছিল তাতে এটাই স্থির ছিল যে সেখানে মুসলিমদের প্রাধান্য বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চল পাকিস্থানে যাবে যেহেতু বাংলায় চিরকালই মুসলিমরা সংখ্যাধিক অংশ সেহেতু পাকিস্থানে যাবে। দ্বিতীয় মতামত ছিল সুরাবর্দী এবং শরৎ বসুর ফর্মুলা। সেটা ছিল যে বেঙ্গল ইন্ডিয়াতেও যাবে না, পাকিস্তানেও যাবে না। আমরা বাঙালি, তাই এপার ওপার এসব একাকার, আমরা এক হয়ে থাকবো। একটা সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র হিসেবে আমরা থাকব। ভারতবর্ষের মত বিরাট রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে থাকলে এটা সবাই জানে যে হিন্দুরা বাংলা রাষ্ট্রে এক-তৃতীয়াংশেরও কম হয়ে দাঁড়াবে। এই অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রস্তাব করলেন যে ভারতবর্ষ যদি ভাগও হয়, তাহলে বাংলাকে ভাগ করতেই বা ক্ষতি কি? বাস্তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে ভাগ করলেন, আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলাকে ভাগ করলেন। তিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষাবিদ। কিন্তু হঠাৎ রাজনীতিতে এসে তিনি সেই সময়ে ঝড়ের মতো বহু গ্রামগঞ্জে গিয়েছিলেন এবং সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় সংকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পেরেই বাংলা ভাগের সমর্থন করেছিলেন। হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি যে একটা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে নিশ্চিত হবার মুখে পৌঁছে গেছে তা তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে কতটা দূরদর্শী ছিলেন সেটা বোঝা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পড়ে থাকা হিন্দুদের দিকে তাকালে।

যারা অনেক আশা করে রয়ে গেলেন, তারাও দফায় দফায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি এই ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যে নির্বাচন হলো বাংলাদেশে, তার পরেও অনেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তা এই যে জিনিসটা বারবার সমস্ত প্রজন্মকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে ১৯৪৭ সালে যে পরিবার ছিল, এখন তাদের পরের দুই তিন প্রজন্ম, প্রাণপণে যারা এতদিন থাকার চেষ্টা করেছিল, এখন তারাও চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং দেশভাগ সবার পর চলে আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল

বলেই আজকে অন্তত এই অংশের বাঙালি হিন্দুরা তাদের সম্মান নিয়ে বেঁচেছে। এছাড়া আমরা যাদের পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বলছি যারা অনেক অংশে সম্মানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, তারাও যে প্রাণে বেঁচেছেন তারা কারণ হচ্ছে তারা এদেশে চলে এসেছিলেন।

এই উদ্বাস্তু হয়ে আসায় হচ্ছে প্রথম সমস্যা। কিন্তু এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা চলে এসেছিলেন। এছাড়া এসময় নিরাশ্রয় হয়ে যাবার জন্য মহিলাদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের কি ভূমিকা ছিল? দেশভাগ হবার আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মহিলাদের শিক্ষার হার কত ছিল? একেবারেই কম। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা এই সংসার বাঁচানোর তাগিদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি নেয়। আজকে সব চাকরির ক্ষেত্রে এই যে মহিলা ও পুরুষদের সমান প্রতিযোগিতা, এতে তথাকথিত 'উদ্বাস্তু' নারীদের অবদান অসীম।[৯] পূর্ববঙ্গের নারীদের ভূমিকা ছিল এমন তারা ছিলেন পুরুষের সঙ্গে সমতুল্য জীবন যুদ্ধে সমান অধিকারিণী। শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত পেশায় তারা ঢুকে পড়লেন। তাদের কাছে কোন পেশায় নিচু নয়। সরকারি অফিসের কেরানি হিসেবে, নানান জায়গায় কারখানার শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়- এমনকি যোগ্যতা অনুযায়ী দরকার হলে রাস্তার উপর সব্জী নিয়ে বসে যাওয়া- সবের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন নাগরিক হিসেবে, একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা এবং দৃঢ়তা, এই যে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা- এর তাগিদটা কিন্তু হঠাৎ কোন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া থেকে আসেনি।

আজকের কলকাতা কেন্দ্রিক নগরায়নও কিন্তু সম্ভব হয়েছে বাংলা ভাগের জন্য।পূর্বঙ্গের ছিন্নমূল মানুষ রুটি রজগারের আশায় পশ্চিমবঙ্গে আসায় এখানে খুব দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বিজয়গড় কলেজ গড়ে ওঠার কথা বলা যায়।

জাতীয় সংগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে সেনানিবাস থেকে যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সে থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এরপর থেকে

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ এই স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে ভারতবর্ষের আপামর জনগণ তাদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোল, ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাছাড়া চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদহিন্দ বাহিনীর কর্মকাণ্ড সমান ভাবে প্রবাহিত হয়েছিলো। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের অবদান কোন অংশে কম ছিল না। বাংলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, থেকে শুরু করে ছাত্র- যুব সমাজ তথা শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।[১০] একদিকে যেমন বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের আরেকটি অংশ মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপ এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন অংশ নিয়েছিলেন। তেমন আবার নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এঁদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে আংশিক সাফল্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মানুষের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন সর্বোপরি ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ভারতবর্ষকে এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখীতে পরিণত করেছিল। এইসময় গান্ধীজি ১৯৪২ এর ১০ ই মে হরিজন পত্রিকায় লিখলেন-

'আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝেছি যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রেখেই ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যাক সেটাই হবে সকলের পক্ষে হিতকর'।[১১] গান্ধীজীর ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার এই দাবি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রসূত নয়, সকলের কল্যাণে যুক্তিসম্মত বন্ধুত্বমূলক পরামর্শ ছিল এটি।[১২] ভারতছাড়ো আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের সংকল্প নিয়ে ফেললেন ইতিমধ্যে।[১৩]

অন্যদিকে বড়লাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব নিলে সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী এবং সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হবে। ৮ ই আগস্ট মুম্বাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব । ৯আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই গান্ধীজি সহ অন্যান্য সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের জেলে বন্দী করা হলো। গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের গ্রেফতারের খবর জানাজানি হতেই সারাদেশে হিংসা ছরিয়ে পড়লো । পুলিশ থানা সরকারি ভবনে আগুন, টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট করা, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, সরকারি অস্ত্রাগার কোষাগার এবং অন্যান্য কার্যালয়ে হানা প্রভৃতি চলতে লাগলো। বাংলাতে এই আন্দোলনের ঢেউ কিছুদিনের মধ্যেই বন্যার স্রোতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাংলার বুদ্ধিজীবি থেকে সাধারণ মানুষ শ্রমজীবী কৃষিজীবী সকলেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও এর বাইরে ছিল না।[১৪] তাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া পেশায় অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছে। তিনি গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর সঙ্গে কলকাতায় আসেন আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য। তিনি প্রথমে আকিয়াব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এবং পরে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। তিনি বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কার্যকরী পরিষদের সদস্যও ছিলেন।[১৫] তিনি পুনা কংগ্রেসে ১৯৩২ যোগদান করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ জন্য তাকে এক বছর কারাবাস হয়েছিল। তার সঙ্গে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে আরো অনেকেই ছিলেন যেমন ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দী।[১৬] তিনি জিলা চট্টগ্রাম, থানা রাউজান এর বাসিন্দা। তিনি অসহযোগ আন্দোলন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তাঁর তিন মাস

কারাবাস হয় । তিনি গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । এই জন্য তিনি স্থানীয়দের কাছে ভূপেন গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়াও পুলিনবিহারী বড়ুয়া, বাড়ি চট্টগ্রামের আবুর খিলে, রাজবিহারী বড়ুয়া, বাঁশখালির নরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, রাউজান নীরদবরণ তালুকদার প্রমূখ অসংখ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথম থেকেই গান্ধীজীর ভাবাদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস পথে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলে। এর মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয় এবং অনেকেরই স্বল্পমেয়াদী কারাবাস হয়েছিল । যেমন নীরদ বরণ তালুকদারের দুমাস কারাবাস হয়েছিল। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ও কম ছিল না। উদাহরণ হিসেবে পুলিনবিহারী বড়ুয়ার কথা আমরা বলতে পারি তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এমন কি এক ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া যিনি অসহযোগ আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্লবী ধারার আন্দোলন: বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম বিপ্লবী ধারায় দীক্ষিত হন চট্টগ্রাম এর রাউজান নোয়াপাড়া গ্রামের প্রবীণ বড়ুয়া।[১৭] তিনি ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির সদস্য ছিলেন এবং অনেক বছর ব্রিটিশ কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। পরে তিনি রেঙ্গুন পালিয়ে চলে যান। রেঙ্গুন চলেগিয়ে সেখানেও তিনি বিপ্লবী কর্মধারা অক্ষুন্ন রাখেন। চট্টগ্রামে থাকাকালীন তিনি দলকে গতিশীল করার জন্য পিউরিটি লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মায়ানমারে তিনি আর একটি অনুরুপ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে প্রধানত শরীর চর্চা হতো এবং পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী সদস্য সংগ্রহ করা হতো। রেঙ্গুন থাকাকালীন তিনি বিপ্লব ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজ এর সাথেও তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম পটিয়া থানার মৈতলা গ্রামের মহেন্দ্র লাল বড়ুয়া মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।[১৮] বিপ্লবী কর্মধারাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি ১৯৩২ সালে

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধরা পড়েন এবং ৬ বছর কারাভোগ করার পর তিনি ছাড়া পান। বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর অর্থ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ছদ্মবেশে তাকে জাপানের প্রেরণ করার জন্য মনোনীত করেন। ১৯৭৩ সালে ২৬শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতা মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে তাম্রপত্র প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনার সত্য সংঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'দেবব্রতী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। নিরেন্দ্র চৌধুরি ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে পরেন। এই কারনে ১৯৩৩ সালে নিরেন্দ্র চৌধুরিকে বিচারে আন্দামানে দীপান্তর দেওয়া হয়। তিনিই চট্টগ্রামের একমাত্র দীপান্তর ফেরত জীবিত বিপ্লবী। বিপ্লবী মহেশচন্দ্র বড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলার পাটিয়া থানার বাথুয়া গ্রামের ডাকাতি দলের নেতা ছিলেন। তাঁরা অবস্থাপন্নদের বাড়িতে ডাকাতি করে অস্ত্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন ও দুস্থদের সহায়তা করতেন। পরে তিনি ধরা পড়েন , বিচারে তাঁর কারাদন্ড হয় এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন। তিনি আন্দামানে বন্দি থাকাকালিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে কারাগারে মৃত্যু হয়। চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ এই বিপ্লবিদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ স্থানীয়দের সমর্থন ছাড়া এই ধরণের বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের তারিণী নামে এক মাঝি ছিলেন তিনি মাস্টার দা সূর্যসেন এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের কর্নফুলী নদী পারাপারে সাহায্য করতেন। চট্টগ্রামের রাউজান থানার মাহামুনি পাহাড়তলি গ্রামের পূর্বের তালতলী পাহাড় ছিল বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। সেখানে সভা ও প্রশিক্ষণ চলতো। এই আস্তানায় গোপনে বোমা বানাতে গিয়ে মহামুনি গ্রামের বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর হাত পুড়ে যায়। রাওজান থানার আবুরখিল গ্রামের দক্ষিন ডাকা খালির জৈতবন বিহার এবং বোয়ালখালি থানার শাকপুরা গ্রামে ধর্মানন্দ বিহার বিপ্লবীদের অস্তানা ছিল। বিপ্লবী কর্মকান্ডে বৌদ্ধ মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে নিরুপমা বড়ুয়া, প্রভা মুৎসুদ্দি ও চারুকলা বড়ুয়ার নাম উল্লেখ যোগ্য।[১৯]

চট্টগ্রাম কলেজের পালিভাষার আধ্যাপক মহিম বড়ুয়ার মেয়ে নিরুপমার সাথে বিপ্লবী কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বাংলার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত বাঙালি বৌদ্ধরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কারণ তাদের মূল বাসভূমি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। ফলে দেশভাগজনিত কারণে তারা বাধ্য হন নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে। এরফলে তাদের সাংস্কৃতিক অবনমন ঘটে। জাতীয় সংগ্রামে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করলেও স্বাধীনতা অর্জনের পর তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. সুমিত সরকার: *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭,* (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ২০০৪)।

২. Judith Brown: *Gandhis Rise to Power 1915-1922* (CUP, 1974).

৩. সুমিত সরকার: *প্রাগুক্ত,* পৃ.

৪. *তদেব,* পৃ. ৩৭৩।

৫. সোমদত্তা মণ্ডল ও শুক্লা হাজরা: *বঙ্গবিভাগ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন,* (কলকাতা দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০২), পৃ.৯।

৬. Amit Bhattacharaya: *Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920,* (Calcutta, I.N.A. Press, 1986).

৭. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়: *বঙ্গবিভাগ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব,*((কলকাতা দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০২), পৃ.১৪।

৮. *তদেব,* পৃ. ১৮।

৯. *তদেব*।

১০. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া: *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়,* (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৭৩।

১১. *হরিজন পত্রিকা,* ১৯৪২, ১ মে।

১২. Press Interview, May 16, 1942, *The Transfer of Power, Vol. II,* পৃ.৯৬।

১৩.দেবচন্দ্র ঝা: *মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ও ভারত ভাগ,* (কলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, ২০০৩), পৃ. ৩৩।

১৪. প্রণব কুমার বড়ুয়া: *মুক্তি যুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১)।

১৫.জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬৯।

১৬. *তদেব।*

১৭. *তদেব*।

১৮. *তদেব*।

১৯. *তদেব*।

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের অভিগমন

১৯৪৭ খ্রি. ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। এই আইনে ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়। ৩রা জুনের পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত বিভাজিত হয়। র‍্যাডক্লিফ রেয়াদ অনুসারে, ভারত একটি মাত্র ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে থাকলেও পাকিস্তানের ভূখণ্ড দুটি পৃথক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়ে যায়, যা এঁকে অপরের থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করত। এভাবে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ট জনগণ ভারত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বালুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ দেশভাগের পূর্বে দুটি প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৯১.৮% শতাংশ এবং ৭২.২ শতাংশ।[১] কিন্তু সবথেকে বেশি সমস্যা দেখা দেয় বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে নিয়ে। কারণ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট হলেও এই প্রদেশ দুটিতে সম্পূর্ণ রূপে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল না। দেশ ভাগের পূর্বে বাংলায় ৫৪.৪ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা ছিল অন্যদিকে পাঞ্জাবে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫৪.৪ শতাংশ।[২] যাইহোক, বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের পৃথক দুটি কমিটি গঠিত হয়। র‍্যাডক্লিফ ছাড়া বাংলা সীমানা কমিশনের অপর চারজন সদস্য ছিলেন যথা---i) চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ii) বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, iii) আবু সালেহ মহম্মদ আক্রাম ও iv) এম. এ. রহমান।[৩] ছাপানো অক্ষরে মাত্র ৯ পাতায় বাংলার সীমানা বিভাজিত হয়।

র‍্যাডক্লিফ ১৯৪৭ খ্রি. ১৬ই আগস্ট বিকাল ৫টায় সীমানা কমিশনের সুপারিশের কপি তার সদস্যদের বোঝার সুযোগ দেন। এরপর র‍্যাডক্লিফ দুটি পৃথক খামে করে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের সুপারিশ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে তুলে দেন। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উৎসব যাতে কালিমালিপ্ত না হয় তার জন্য

দু'দিন পর অর্থাৎ ১৭ ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের হাতে র‍্যাডক্লিফের সুপারিশগুলি তুলে দেওয়া হয়। কলকাতাসহ সম্পূর্ণ বর্ধমান ডিভিশন, দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। এছাড়া দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল ঢাকা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা।[৪] র‍্যাডক্লিফ কমিশনের দ্বারা জেলাস্তরের হিন্দু বা মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন জেলা ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল থানাস্তরে হিন্দু বা মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। সেজন্য বাংলার বেশ কয়েকটি জেলা বিভাজিত হয়ে কিছুটা পূর্ববঙ্গ এবং কিছুটা পশ্চিমবাংলার সাথে যুক্ত হয়। যেমন, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলি দ্বিখণ্ডিত হয়। দ্বিখণ্ডিত এই জেলাগুলির কয়েকটি থানা ভারত এবং কয়েকটি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে আবার উভয় বঙ্গের ভৌগোলিক সুবিধার কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের মধ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় অন্যদিকে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ট খুলনা জেলা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫] কিন্তু বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ চট্টগ্রাম জেলায় ৯৮ শতাংশ অমুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করা সত্ত্বেও র‍্যাডক্লিফ কি কারনে তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। এই দেশভাগ অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতোই বাংলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের ওপরও চরম আঘাত হেনেছিল। ১৯৪৭ খ্রি. দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার প্রায় ৩০ শতাংশ হিন্দুসহ প্রায় ৪৫.৬ শতাংশ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন।[৬] দেশভাগের পরবর্তীকালে ১৬.৬ মিলিয়ন অমুসলিম পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। তাদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের আগমন ও আশ্রয়ও গ্রহণের পরিসংখ্যানটি ভয়ানক। দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে এসে ভারতে আশ্রয়ও গ্রহনোকারী এই বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ভারত সরকার Displaced Person বলে নামকরণ করেছেন। Annual Report of the Department of Rehabilitation, 1965-66 থেকে প্রাপ্ত Displaced Personএর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

“A displaced person is one who had entered India (who left or who was compelled to leaved his home in East Pakistan on or after October 15, 1947) for disturbances or fear of such disturbances or on account of setting up of the two dominions of India and Pakistan” [৭]

অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ খ্রি. একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে একসময় যারা কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। স্বাধীনতার স্বাদ তাদের কাছে দেশভাগের অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছিল। যার সবথেকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল বাংলার মানুষ। চিরকালীন শান্তিকামী বাংলার বৌদ্ধরাও এর এর থেকে রেহাই পেল না। চট্টগ্রামে তারা সংখ্যাধিক্য থাকলেও তারা দেশের মধ্যে হয়ে পড়লো সংখ্যালঘু। ফলত নানা ধরনের সমস্যায় সম্মুখীন হতে হল তাদের। স্বাধীন দেশেও নানা কারণে নানা স্থানে তারা কোনঠাসা হতে লাগলো। ফলত অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের স্বদেশ ছেড়ে ভারতের নানা প্রান্তে আশ্রপ্য নিতে শুরু করলো। এদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কলকাতা, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলিতে এসে আশ্রয়ও নিয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেহেতু বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ট ছিল সুতরাং অনেকেই সরাসরি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন নি। যেহেতু ত্রিপুরা আর চট্টগ্রাম একই সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করেছিল তাই প্রচুর মানুষ ত্রিপুরা হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আবার কিছু মানুষ আসাম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে।

চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের পলায়নের এই ধরনের অসংখ্য কারণ ছিল। সুন্দরী মেয়ে দেখলে তুলে নিয়ে যাওয়া, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন এবং সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্তাস। পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে সব থেকে বড়ো উচ্ছেদ ঘটে কাপ্তাই বাধা নির্মাণের মধ্য দিয়ে। রাঙা মাটির কাছে নদীর তীরবর্তী গ্রাম কাপাতিয়ে কর্নফুলি নদীতে এক বিরাত বাধ নির্মানো মধ্য দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৬০ এ কাপ্তাই বাধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে কর্ণফুলি নদীর উপত্যাকা এলাকায় এক বিরাট হ্রদের সৃষ্টি হয়। এবং তার ফলে বহু গ্রাম প্লাবিত হয়। এই এলাকায় মূলত

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমা জনজাতির বাস ছিল। এই চাকমারাই বাংলাদেশের বৃহত্তর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী।[৮] ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে চাকমা জনজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫৩০০০।[৯] চাকমাদের শতকারা ৯০ জনেরো বেশি চট্টগ্রামের রাঙামটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় কেন্দ্রীভূত। কিন্তু কর্ণফুলি নদীর ওপর বাধ নিররামণেরফলে যে বিশাল অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল সেখানে চাকমা জনজাতির লোকেরাই সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারি তরফ থেকে কোনরকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। ১০০০০০রও বেশি লোক কর্ণফুলির কৃত্রিম প্রকল্পের কারনে অন্যত্র চলে যায়। যাদের বেশিরভাগ ছিল চাকমা। চাকমরা বিরোধীতা করলে সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের দমন করা হয় নির্মমভাবে। এমনকি ধর্ষন, হত্যার মতো জঘন্য অমানবিক অত্যাচার সবই চলে তাদের ওপর। অনেকেই স্থানচ্যুত হয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এবং জেলার অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। তবে ১৯৬৪ সালে হাজার হাজার চাকমা ভারতে আশ্রয়ও নেয়। ফলে চাকমাদের মধ্যে এমন ধারনা গড়ে ওঠে যে, তাদের অভাবুভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষ আন্তরিক নন। আর এর ফলস্বরূপ তৈরি হয় পি.সি.কে.এস.এস যা "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের ফলে উৎখাতিত চাকমা জনজাতির মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। কোচবিহারে ৩০জন, আলিপুরদুয়ারে ২০জন, জলপাইগুড়িতে ২০জন, দার্জিলিং এ ১০জন, মালদহে ১১০ জন, মুর্শিদাবাদে ৩০জন, নদীঊয়াতে ৩০জন, উত্তর ২৪ পরগনাতে ১৪০জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ১০জন, বর্ধমানে ৩০জন, বাঁকুড়াতে ১০ জন, পুরুলিয়াতে ৩০ জন, হুগলীতে ১০ জন, হাওড়াতে ১০ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ২০জন।[১০]

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সমস্ত বৌদ্ধরাই যে হিংসা, দাঙ্গা বা ধর্ম বিদ্বেষের জন্য এসেছে এমনটা কিন্তু নয়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার চট্টগ্রামে বড়ুয়া সম্প্রদায়ে/ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষিত ছিলেন। ফলে কর্মসূত্রে অখণ্ড বাংলা তথা ভারতে তাদের যাতায়াত ছিল। ফলে কর্মসূত্রে অনেকে এদেশে এসেছেন। উদাহরনস্বরূপ আমরা লতিকা বড়ুয়ার স্বামীর কথা বলতে পারি। তার মূল নিবাস ছিল চিটাগাঙ, রজন্তাতে।

কিন্তু তিনি চাকরি করতেন কলকাতার বাবুঘটে। তার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় বিয়ের দশ বছর পর তারা চিটাগা থেকে কলকাতায় চলে আসেন।[১১] মনমোহন বড়ুয়ার কথাও আমরা বলতে পারি। চট্টগ্রামের পাটিয়া থানায় পাতুরিয়া গ্রামে তার বাড়ি। তিনি বাগরাকোটে ক্যানিন চালাতেন। এই কর্মসূত্রেই তিনি ভারতে চলে আসেন।[১২] এছাড়া ব্রিটিশ আমলে বাংলার লাকসাম অঞ্চলে রেলের সবথেকে বড় জংশন ছিল। সেখানে একটি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ছিল। ফলত ঐ অঞ্চলের অনেকেই রেলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অঞ্চলটাতে সিংহ পদাধিকারী অনেকেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফলত কর্মসূত্রীরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন বিশেষত হাওড়া, আসানসোল, যেখানে রেলের জংশন ছিল। আবার অনেকে এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে, পারিবারিক ঝামেলা ও শরিকি বিবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য।[১৩]

সুতরাং নানাবিধ কারণে পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। সংখ্যাগত দিক থেকে এরা কম হলেও তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে বাংলার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিবর্তন

সংস্কৃতি অতি জটিল একটি ধারণা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে এডওয়ার্ড টেইলর সংস্কৃতিকে সঙ্গায়িত করেছেন মানুষের বিশ্বাসও, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্ন হিসাবে। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাসও; রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন; উৎসব ও পার্বন; শিল্পকর্ম এবং প্রতিদিনের কাজকর্ম ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি।[১৪] সংস্কৃতি হল কোন জাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা ও কর্মধারার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, কোনো সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন। মানুষের জীবনাচারণের যে পরিবর্তন কিম্বা সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন প্রগতির পথ আসে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সংস্কৃতির বহমান ধারা। নতুন রীতি সন্ধানী হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজ প্রগতির ধারায় যুগে যুগে কালে কালে নতুন সংস্কৃতি এসে মিশেছে। ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহুজাতিক ও বহুবর্ণিত।

ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, আহার-বিহার, চালচলন, জীবনযাপনপ্রনালি, উৎপাদন পদ্ধতি, ধর্ম, বর্ণ প্রথা ইত্যাদি বস্তগত সংস্কৃতি আর শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, প্রভৃতি মানস সংস্কৃতির সম্মিলনেই কোন জাতি যা দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে। ড. আহমদ শরীফ সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন, "সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।"[১৫]

বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বহন করছি তা অনেক পুরানো। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে যুগে যুগে শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভন্ন দেশের সংস্কৃতি মিশেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোর্য, গুপ্ত, পাল, সেন এবং মধ্যযুগে আবার তুর্কি, মুঘল অতঃপর ওলন্দাজ, পুর্তগীজ, ফরাসী ও সবশেষে ইংরেজ অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি মিশ্রণে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র পরিস্ফুট হতে থাকে। খ্রি. সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল আমলে ৭৫০ থেকে ৪০০ বছর ধরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত বাঙালির জীবন যাত্রায় এক সমন্বিত কৃষ্টি স্থায়ী আসন লাভ করে।[১৬]

প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি প্রাকৃতের স্তর পেরিয়ে অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ (রচনাকাল ৬০০থেকে ১২০০খ্রি.)। এই চর্যাপদগুলিতে বর্তমানে কবিতা হিসাবে উল্লেখ করা হলেও এগুলি ছিল মূলত চর্যাগীতি। বৌদ্ধদের দোঁহা ও গান বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত।[১৭] বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্যগণ তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্ববাদ রূপায়নের মধ্য দিয়ে সত্যিকার কবি হয়ে উঠেছেন। তাই ধর্মতত্ব প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। আর তাই বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের যথার্থ গুরুত্ব শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতি তথা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

মূলত বৌদ্ধ মত প্রচার সূত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্বদেশের পরিচয় ঘটে। বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন

মহাবীর স্বয়ং জৈন বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমন ভিক্ষুরাই প্রথমে গৌড়ে রাঢ়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং এর মধ্য দিয়েই উত্তর ভারতের শাস্ত্রসংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ শাসন, অস্ত্র-বস্ত্র প্রভৃতি জীবন পদ্ধতি ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সাথে এদেশিয়দের পরিচয় ঘটে।[১৮] এভাবেই এদের জীবন-জীবিকায় আর্যায়ন সম্ভব হয়। অর্থাৎ জোইন-বৌদ্ধ মত প্রচার সূত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণপূর্ব দেশের যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটে এবং বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সঙ্গে আসে বৌদ্ধ মৌর্য শাসন। এই বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণের মাধ্যমেই এদেশীয় আদিবাসীরা উত্তর ভারতীয় ভাষা, লিপি, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হতে পেরেছিল। মৌর্য আমলে এ আর্যায়ন হয়তো গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্ত যুগে তা কলিঙ্গ, সুহ্মে, বঙ্গে সমতটে প্রভৃতি ুঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। বগুড়ায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্ম অক্ষরে লিখিত এবং প্রকৃত ভাষায় রচিত শিলিলিপিতে মৌর্য সাসনের প্রমান মেলে। মৌর্য বংশের শাসনকালে থেকে শুরু করে গুপ্ত পাল চন্দ্র বংশের শাসনকাল পর্যন্ত এ বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সপ্তম শতকের গোড়ায় খড়্গ বংশীয় রাজাগণ অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল বংশীয় রাজাগণ চন্দ্র বংশীয় রাজাগণ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[১৯]

সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজ সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ ধর্ম এবং ধর্বালম্বী মানুষ তার নিজস্ব ছাপ রেখে চলেছেন। আধুনিক ভারতের দিকে তাকালেও বৌদ্ধ ধর্মের/ দর্শনের প্রভাব অতি স্পষ্ট। যদিও মধ্যকালীন বাংলার বৌদ্ধরা কিছুটা কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে সেন রাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা। ফলে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের অনেকেই হিন্দু ধর্মের ছাতায় তলায় আশ্রয়ও নেন। আর্য অধিকারের পর এ বাঙ্গাল্য হিন্দু ধর্মের প্রভাবই বেশি ছিল। অভিজাত শ্রেণি ও ধর্মীয়রা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা হিন্দু ধর্মের প্রতি ছিল বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ। যে কারণে তারা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর

দীর্ঘদিন বাংলা থেকে বৌদ্ধ ধর্মের জনসংখ্যা কমে গেলেও বাঙ্গাল্র সাংস্কৃতিক জগতে বৌদ্ধদের অবদান রয়েই গেছে। আধুনিক বাংল তথা ভারতের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধদের অবদান অনস্বীকার্য।

ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির সম্মিলনে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতির প্রভাবে ও যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করেছে। তবে সবচেয়ে শেষে যে সংস্কৃতি এসেছে তা হচ্ছে পাশাচত্য সংস্কৃতি এবং এটা এসেছিল ইংরেজ আমলে। আজ বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি চরম সংকটে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় বাঙালি সংস্কৃতি আজ ভস্মীভূত হতে চলেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি প্রতিনিয়িত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও বাংলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের সংস্কৃতি ও নিজ স্বতন্ত্রতাকে বিসর্জন দেন নি। এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতাকে বজায় রাখতে পেরেছে।

বাংলা সহ সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বয়স আড়াই হাজার বছরেরও বেশি। সেই তুলনায় বাঙালি সংস্কৃতি অনেকটাই নবীন। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবোধের জন্ম বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকালে তখন থেকেই প্রতিদিন বাঙালি সংস্কৃতি ঋদ্ধ হয়েছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। যেকোন জাতির ভাষা তার সংস্কৃতির মূল উপাদান। এবং সেই সঙ্গে ভাষা নিজেই সংস্কৃতির ধারক বাহকও বটে। সেই দিক থেকে দেখলে বালির যে বাংলা ভাষা তার উৎপত্তির মূলে কিন্তু এই বৌদ্ধরাই যারা গীতি আকারে বাংলা ভাষায় জন্ম দিয়েছিলেন যেমনটা আমরা চর্যাপদের.....কালক্রমে বাংলা ভাষারও বিভিন্ন আঞ্চলিকতগা লক্ষ করা যায়। ভারত বিভাজনের সময় ও তার পরবর্তী কালে বিভিন্ন কারণে যাএয়া পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু বড়ুয়া সম্প্রদায়। যারা মূলত চট্টগ্রামের CHI এর বাসিন্দা ছিলেন এবং এনারা চাটগাইয় ভাষায় কথা বলতেন। এখানে আসার পরেও

তারা তাদের নিজস্ব মাতৃ ভাষাকে যত্নে লালন পালন করে চলেছেন এবং তাদের বাড়িতে তাঁরা তাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ চাটগাও ভাষায় কথা বলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন উনুনকে চাটগাঁওইয়া ভাষায় 'চুলা' বলা হয়। কিন্তু যেহেতু তাদের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে থাকতে হয় সেই কারণে জীবন জীবিকার সূত্রে তারা বাংলা ভাষাকে ভালো ভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে।[২০] বাংলাদেশে বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু হলেও এখানে (পশ্চিমবঙ্গে) এসে তারা সংখ্যালঘুতর হয়ে গিয়েছে। তাই তারা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় মূলভূত সুযোগ সুবিধাগুলি তারা পাই না। ফলে বাঙালি ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। বজায় রাখা চেষ্টা করা হয় কিন্তুউ তা সত্ত্বেও হয়ে অঠে না। কারণ স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিরাপত্তার প্রসঙ্গে চলে আসে তাই এখন এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে এই সব কারণে আপোষ করছে। এবং সচেতনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলের বাঙালিরাও তারা তাদের আলাদা মনে করছে না। এই কারণে হিনমন্নতা বা বিরক্তি জনিত সমস্যা দূর হয়ে যাচ্ছে। ফলত আসলে যারা আছে তারা অসমীয়াদের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে। যারা আছে তারা ওখানকার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিচ্ছে। আর বাংলায় যারা আছে তার বাঙালিদের সাথে মানিয়ে নিচ্ছে।

বৌদ্ধধর্মের যে মূল আদর্শ 'অহিংসা পরম ধর্ম' সকলের প্রতি যে প্রেম ভালবাসা সদভাব বজায় রেখে চলা তা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ বজায় রেখে চলেছে বিশেষত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো।

এক্ষেত্রে আমরা সংঘরাজ সম্ভোধি বুদ্ধ বিহার বৌদ্ধ ধর্মসভায় অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু সেই ধর্মের ধর্মগুরুদের ডাকা হয়নি। পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ে শিষ্ট লোকজনেরা রয়েছে তাদেরকেও সেখানে আমন্ত্রণো করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি ভদন্ত শ্রংকর থের মহাদয়ের শুভ আগমন উপলক্ষে ২৭.০৪.২০১৯ তারিখে টালিগঞ্জ মুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতি আয়জনে সঙ্ঘরাজ সম্ভোধি বুদ্ধবিহারে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল।[২১] সেখানে যেমন বিভিন্ন ভিক্ষু ভান্তেরা উপস্থিতি ছিএন তেমনি অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিখ

ধর্মগুরু সুখরঞ্জন সিংহ আলুওয়ালি ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে উপস্থিতি। জৈনধর্ম গুরু মুনি মহারাজ হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম ভট্টাচার্য মহাদয়।

বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচরণ নিজেদের মতো পালন করলেও বিভিন্ন ভাবে ঢুকে গিয়েছে হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ে যে সমস্ত আচার আচরণ রয়েছে সেগুলির হাত থেকে বাংলার বর্তমান বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারে নি। বিশেষত নতুন প্রজন্মের যারা রয়েছেন। শুধু হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানেই যোগ দেওয়া সেসব তো রয়েছে। সেইসঙ্গে বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে পূঁছে গিয়েছে হিন্দু পূজার্চনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় মীরা বড়ুয়ার কথা। তার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকাররে তিনি জানিয়েছেন,

> "আমরা পূজার্চনা না করলেও আমাদের পরবর্তী বর্তমান প্রজন্ম এর থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি। দুর্গাপূজা, কালিপূজাতে ভোগ দেওয়া থেকে ঘরে ঘরে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা তারা সবাই করেন।। হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাসাপাশি সহবস্থান করা কালিণ তাদের মধ্য যে সমন্বয় ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত তা সকলেই কমবেশি স্বীকার করে নিয়েছেন।"[২২]

বাঙালি বৌদ্ধ যাঁরা ওপার বাঙ্গাল থেকে এসেছেন তাঁদের আত্ম পরিচয়ের মৌলিক ও সমগুরুত্বপূর্ণ উপাদান দুটি একটি দেশ অন্যটি ধর্ম। কারণ রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি তাআ যেমন দায়বদ্ধ তার উদাহরণ আমরা পাই কালচক্র বুদ্ধ মন্দিরে ধর্মসভা শুরু আগে তাদের নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে ধর্মসভার শুভ সূচনা করার মধ্য দিয়ে। তেমনি অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদী পরমত সহিষ্ণু, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল ধারণা বাংলার বৌদ্ধদের আত্ম পরিচয়ের মৌলিক উপাদান –সকল ধর্ম সম্প্রদায়ে ধর্মগুরুদের নিয়ে ধর্মসভা ও শুভেচ্ছা বিনিময়।

এটাই বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য যা এদেশের মাটিতে লালিত, বিকশিত প্রাচীনতম ধর্ম যা হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এবং ঐতিহ্যের সাথে পূর্বোক্ত অন্যান্য ধারায় সংঘাত নেই বরং তার সাথে সমন্বয় সম্ভব এবং কাঙ্খিত।

আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে জনময়ানসে নানা ভ্রান্তি দেখা যায়। কিন্তু বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন কোন লক্ষন বিন্দুমাত্র নেই। বৌদ্ধ বাঙালির নানাবিধ উৎসব, পার্বন, লৌকিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তার আত্মপরিচয়ে বিধৃত। এসত্বেও তার ধর্মীয় সংস্কৃতি ব্যপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু বৌদ্ধ বাঙ্গালির মানসে ধর্মাতিশারী বৃহত্তর জাতিসত্তার সাথে সম্পৃক্তির কারণে উদার মানবতাবাদী অন্য একটি স্রোতধারাও প্রবাহমান। এই স্রোতধারায় মিশেছে মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ। এই ধারায় প্রতিফলন বৌদ্ধ বাঙালি ক্রিয়া কর্মে যথোচিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদি না হত তাহলে বৌদ্ধ বাঙালি বৃহত্তর বাঙালি সত্তার পরিমণ্ডলে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারত না। বৃহত্তর জাতিসত্তার সাথে অসংযোগ ঘটলে দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থান ও গোউন ভূমিকা নিয়ে তুষ্ট বা অবহেলিত হয়ে থাকতে হবে। এই পরিনতি কোনভাবেই শ্লাঘার হতে পারে না। তাই বাঙালি বৌদ্ধের আপন সত্তার বিকাশ সাধনে নিজেদের পূর্বপুরুষগত ধর্মীয় ঐতিহ্য যেমন একদিকে লালন করে চলেছেন তেমনি তারা সাম্প্রদায়কতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর জাতিসত্তার সাথে বিভিন্ন ভাবে সংযোগ সেতু নির্মাণ ও লালন করে চলেছেন।

উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান

দেশবিভাগের পর ও আগে চট্টগ্রামের অনেক বড়ুয়া বৌদ্ধ জীবিকার সন্ধানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান সমূহে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তাদের নিজেদের ধর্মীয় সংস্কারদি পালন করার মত কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিন্মা ধর্মগুরু উত্তরবঙ্গে ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় কর্মযোগী কৃপাশরনো মহাস্থবির দার্জিলিং এ ১৯২০ সালে 'গন্ধমাদন বিহার' প্রতিষ্ঠা কত্রেছিলেন থেরবাদীদের জন্য।[২৩] কিন্তু সেখানে সমতলের বৌদ্ধদের যাতায়ত সহজ ছিল না। স্বাধীনতার ২/৩ বছর পর চট্টগ্রাম থেকে শ্রীমৎ অতুলসেন ভিক্ষু দার্জিলিং এসেছিলেন এবং গন্ধমাদন বিহারেই অবস্থান করেছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় যে সমস্ত বড়ুয়ারা রয়েছেন তাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ডুয়ার্সে এসেছিলেন। ১৯৪৯ সালে প্রথম ডামডিমে একটি ভাড়া করে ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়ে উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ

করে দেখতে পেলেন এখানে যে সকল থেরবাদী বৌদ্ধরা রয়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করে নিজেদের ধর্মরক্ষার্থে একটা বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে এরা নিজেদের ধর্ম, সংস্কার, আচার সবই ভূলে যাবে। তাই তিনি অনেক চেষ্টা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে সকলকে সংগঠিত করে জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের সহায়তায় মালবাজারে উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সংঘাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯৫০ সালে।[২৪] অতঃপর উত্তরবঙ্গের সকল বৌদ্ধদের একমাত্র মিলন কেন্দ্র হলএই উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রম। বৌদ্ধদের বিশেষ অনুষ্ঠান বুদ্ধপূর্নিমাতে সবাই যোগদান করতেন বুদ্ধবাণী শ্রবণ করতেন। ফলে ধীরে ধীরে সবাই ধর্মসচেতনহয়ে উঠলেন। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের বসবাসকারী বৌদ্ধরা নিজেদের এলাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন, ফলে শ্রীমৎ অতুল সেন ভিক্ষুর কাছ থেকে অনুপ্রানিত হয়ে ১৯৫৬ সালে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরা কাটায় বুদ্ধ জয়ন্তী দিবসে প্রতিষ্ঠিত হল 'বুদ্ধ-জয়ন্তী' বিহার।[২৫] ফলে নাগরা কাতার নিকট যে সকল চাবাগান রয়েছে সেখানে বসবাসকারী সকলে ঐ বিহারে ধর্মাচরণ করার সুযোগ পেলেন। শ্রীমৎ বিপুলসেন ভিক্ষু ঐ বিহারে ছিলেন।কিন্তু তাতেও সকল সমস্যার সমাধান হল না। কারণ সংঘদান করতে গেলে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গে ১/২ জন অবশিষ্ট ভিক্ষু কলকাতা থেকে আনতে হতো। এটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আর একটা উপায় ছিল। যখন কঠিন চীবর দানোৎসব হত তখন কলকাতা থেকে ভিক্ষুরা আসতেন। কঠিন চীবর শেষ হওয়ার পর দিন কেউ কেউ সঙ্ঘদান করার সুযোগ পেতেন। এইভাবে চলতে চলতে ১৯৬৩ সালে শিলিগুড়ি 'বুদ্ধভারতী' বিহার প্রতিষ্ঠিত হল। শিলিগুড়ির বৌদ্ধরা ওই বিহারের ভিক্ষুর মাধ্যমে ধর্মীয় আচারাদি পালন করতে লাগলেন। রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির যখন বুদ্ধভারতীয় বিহারাধ্যক্ষ ছিলেন সে সময় আরও ২/৩ জন ভিক্ষু তাঁহার শিষ্য ছিলেন, তখন উত্তরবঙ্গে সঙ্ঘাদানাদি অনুষ্ঠান করার কোন অসুবিধা ছিল না। তারপর নাগরাকাটায় নাগরাকাটায় জেতবন-বিহার যাতে আর একটি বিহার হল ১৯৬৮ সালে। গত ২০/২২ বছর থেকে শ্রীমৎ জ্ঞানোত্তর মহাস্থবির বিহারাধ্যক্ষ।[২৬]

১৯৭১ সালে 'ডুয়ার্স বৌদ্ধ মৈত্রী বিহার' বিন্নাগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৭৩ সালে থেকে শ্রীমৎ অতুল সেন মহাস্থবিরের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ জিনসেন ভিক্ষু ঐ বিহারের বিহারাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[২৭]

১৯৭৭-৭৮ সালে ময়নাগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধশান্তি বিহার। ময়না গুড়ি, দোমোহনী, জামালদহ প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধরা এই বিহারে যোগদান করে থাকতেন।[২৮]

১৯৮১ সালে শিলিগুড়িতে আরও দটো প্রতিষ্ঠান হল। প্রথমটি হল শ্রীমৎ জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের উদ্যোগে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় বিদর্শন ধ্যান আশ্রম। আর দ্বিতীয়টি হল শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবিরের উদ্যোগে গুরুংবস্তি বৌদ্ধ সমাজ বিহারএবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শিক্ষা এবং গবেষনা কেন্দ্র। বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে শ্রীমৎ জ্ঞানজ্যোতির প্রয়াণের পর শ্রীমৎ অমৃতানন্দ মহাস্থবির বিহারাধ্যক্ষের দায়ত্ব পালন করেছেন। আর শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবিরের প্রয়ানের পর বৌদ্ধ সমাজ বিহারের দায়িত্বে রিয়েছেন শ্রীমৎ বিনয়পাল মহাথের।[২৯]

১৯৪৯-৮৩ সালে প্রতিষথিত হয়েছে ডামডিম শান্তিনিকেতন বোধিসভা। ১৯৪৯ সালে শ্রীমৎ অতুলসেন ঐ ভাড়ার ঘরে অবস্থানকালীন বুদ্ধ পুর্ণিয়াম উৎসব করেছিলেন। সেই সূত্রে ১৯৪৮ সালেই ডামডিমে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যেতে পারে যদিও তার পূর্ণানজ্ঞরূপ দিয়েছেন ১৯৮৩ সালে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহাস্থবির। যিনি বর্তমান একোটি মনোরম আকর্ষণীয় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছেন।[৩০]

১৯৮৬ সালে আলিপুরদুয়ার জংশন, দমনপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধ তপোবন বিহার। এখানেও স্থায়ী কোন ভিক্ষুর পরিচয় পাওয়া যায়নি। ১৯৯২ সালে জয়গাঁ মঙ্গলাবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধ বিহার। এখানেও স্থায়ীভাবে কোন ভিক্ষুর ছিল না। ২০০৫/০৬ সালে শিলিগুড়ি সালুগারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিউমেনিস্টিক বৌদ্ধ মিশন'। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ থের, তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু করেছিলেন।[৩১]

১৯৫০ সাল থেকে অদ্যাবধি বারটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গে। ফলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী সকলে সহজভাব নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং সময়মত

ধর্মাচরণ করতে পারছেন। যতদিন শ্রীমৎ অতুলসেন মহাস্থবির জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই উত্তরবঙ্গের ভিক্ষুদের পরিচালনা করতেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর প্রয়ানের পর উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু পরিষদ গঠিত হল। ফলে সংঘদানদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা আরও সহজ হয়ে গেল। যেমন নিজেদের বিহারাধ্যক্ষকে প্রার্থনা করলে তিনিই পাঁচজন ততোধিক ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে সঙ্ঘদান সুসম্পন্ন করিয়ে দিচ্ছেন। আগে নিজেকে বিহারে বিহারে গিয়ে ভিক্ষুয়া ফাঙ করে দিন ধার্য্য করতে হত। এতগুলো বৌদ্ধ বিহার হওয়ার ফলে বছরে সঠিক সময়ে অনেকগুলো কঠিন চীবর দানোৎসব হয়। তাতে উত্তরবঙ্গের সমুদয় ভিক্ষু সংঘ এবং বহিরাগত পণদিত ভিক্ষুদেরো সমাগম হয়। তাই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়। উত্তরবঙ্গবাসী সকল বৌদ্ধদের এঁকে অন্যের সাথে ঐ অনুষতাহ্নের মাধ্যমে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ হয়। একতা সামাজিক মেলবন্ধনও রচিত হয়। সাথে দান চেতনা ও বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে ধর্ম ও সমাজ সচেতনার ফলস্বরূপ গত ১৯৯৪ সালে গঠিত হয়েছে বৌদ্ধ কল্যাণ পরিসেবা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল উত্তরবঙ্গের সমস্ত বৌদ্ধকে সংগঠিত করা, সমাজকে সুশিক্ষিত করা স্বধর্মকে সংরক্ষণ করা। সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি দুরীভূত করা ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে আসছেন। ১৯৯৯ সালে North Bengal Buddhist Forum গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মহাযানী-হীনযানী ধর্মাবলম্বী গন যৌথভাবে নিজেদের অধিকার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার সুরক্ষার কাজ করে চলেছেন।[৩২]

বিগত ৬০ বছরে থেরবাদী বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রচার এবং প্রসার উত্তরবঙ্গে যঠেষ্ঠ হয়েছে। তথাপি এর মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। যেমন বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বুদ্ধপূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান ইত্যাদি কেবলমাত্র তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বৌদ্ধবাদে অবৌদ্ধদের কাছ থেকে কোন চাঁদা পত্র সংগ্রহ করা হয় না, তাহাদেরকে নিমন্ত্রণও করা হয় না। রাস্তা ঘাটে তোরণ কিম্বা লিপলেট লাগিয়ে বা কোন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারও করা হয় না। স্থানীয় বা সাংগঠনিক ভাবে তেমন কোন পত্র-পত্রিকাও নেয়, যার জন্য থেরবাদী বাংলাভাষী বৌদ্ধরা তাদের নিজস্বতা এখনও পরিস্কারভাবে সকলের কাছে তুলে ধরতে পারে নি। ওন্যদিকে অন্যান্যরা দুর্গা পূজা,

কালিপূজা ইত্যাদি অন্যান্য প্রায় সকল অনুষ্ঠানে তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানায় এবং চাঁদা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এমনকি বৌদ্ধ সন্তানেরাও ঐসব অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

২০০০ সালের পর উত্তরবঙ্গে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের চিন্তা মাথায় রেখে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ত্রিরত্ন মিশনের সম্পাদক ড. শ্রীমৎ সত্যপাল মহাথের থাইল্যান্ড থেকে দানস্বরূপ প্রাপ্ত সারিপুত্ত ও মোগগলান সহ ৪৮৫ কেজি ওজন বিসিষ্ট বুদ্ধ প্রতিকৃতি মাওল পৌর সভার সৌজন্যে এবং দিল্লী ত্রিরত্ন মিশনের সম্পাদক ড. সত্যপাল মহাথের মহোদয়ের আর্থিক সহায়তায় মাল ৩১ নং জাতীয় সড়কের পাশে মাল কমিউনিতি হলের সম্মুখে দর্শনার্থীদের কাছে শান্তির বাণী পৌঁছানোর জন্যে বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে।[৩৩]

উত্তরবঙ্গে বারটা বৌদ্ধ বিহার হলেও এখানে মাত্র ৪জন ভিক্ষু হয়েছেছেন। তার মধ্যে শ্রীমৎ বিনয় পাল মহাথের তিনি বর্তমানে শিলিগুড়িতে অবস্থান করতেন। ড. সত্যপাল মহাথের দিল্লীতে অবস্থান করছেন। শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবির, শ্রীমৎ অতুল সেন মহাস্থবিরের প্রয়ানের পর থেকে মাল উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রমে অবস্থান করছেন। শ্রীমৎ ভিক্ষু সুগত বুদ্ধগয়াতে অবস্থান করেছেন।[৩৪] উত্তরবঙ্গের মাল বাজার বাদে অবশিষ্ট সকল বৌদ্ধ বিহারের বহিরা গত ভিক্ষুরাই অবস্থান করেছেন। এদের মধ্যে অনেকের স্থিরতানেই। অল্পদিনের মধ্যেই অন্যত্র চলে যান। ফলে উত্তরবংগে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংকট একটি চিরাচরিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান

দক্ষিণবঙ্গে বৌদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রিক এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যে সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মের মন্দির ও প্রতিষ্ঠান গুলো রয়েছে তাদের প্রাচুর্য উত্তর বাংলার তুলনায় অনেক বেশি। ইংরেজ শাসনকালে বাংলায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। সমাজ জীবনে নতুন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদি বিচিত্র পথে বাংলার প্রানে নবজাগরণ ঘটতে তাহকে। বাংলায় এ নবজাগরণের ধারায় বিস্মৃত বৌদ্ধ সমাজ ধর্মের মহিমাও পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। কলকাতাকেন্দ্রিক বৌদ্ধ

তাত্ত্বিকরা বৌদ্ধদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য এবং গৌতম বুদ্ধের মহান আদর্শকে সর্বসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে 'Bengal Buddhist Association' গঠন করেন ১৮৯২ খ্রি.।[৩৫] এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃপাশরন মহাস্থবির। এই সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে Sir Edward Arnold বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন নিয়ে লিখতে শুরু করেন।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মগুরু আঙ্গরিক ধর্মপাল এবং ব্রিটিশ সাংবাদিক তথা কবি এডুইন আর্নল দুজনে মিলিতভাবে 'মহাবোধী সোসাইটি'র স্থাপনা করেন। এই প্রতিষ্টানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃজাগরণ।একই সময়ে বুদ্ধের পূন্যভূমিতে বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে Ven kripasaran Mahasthavira চিটাগাঙ থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন। তিনি 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটি জন্মলগ্ন থেকেই তাদের লক্ষে অবিচল থেকেছে। বৌদ্ধদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রতিষ্ঠান দুটির অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৯ খ্রি. বিহার বিধানসভাতে একটি আইন পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে বৌদ্ধ গয়া মন্দির ব্যবস্থাপক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চারজন সদস্য থাকবে বৌদ্ধ ধর্মের চারজন হিন্দু ধর্মের এবং গয়া জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট হবেন এর চেয়ারম্যান। যদিও চারজন হিন্দু সদস্য থাকায় ব্যাপারটি নিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। বর্তমানে তাদের অপসারনের জোরালো দাবি উঠেছে। এইভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক সংগঠন তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিনামূল্যে চিকিৎসা, বাচ্ছাদের স্কুল প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মগুলো তারা করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও এই ধরনের সংগঠনগুলি প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে 'জগৎজ্যোতি' পত্রিকার কথা বলা যায়। এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯০৪ খ্রি.। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন মন্দির এবং বৌদ্ধ সংগঠনগুলি নিজেদেরর স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। বুদ্ধপূর্ণিমা তাদের কাছে একটি পবিত্র দিন। এই দিনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষরা বুদ্ধবাণী শ্রবণ করেন। কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার 'সংঘরাজ সম্বোধি বুদ্ধ বিহার' এবং 'টালিগঞ্জ মূর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতি' (১৯৫০)[৩৬] প্রতিবছর

সকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান তারা পালন করেন। সমগ্র এলাকায় তারা শান্তিমিছিল করে পরিভ্রমণ করেন। এই সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব

বাংলার আদিধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম সেকথা প্রমানিত। বৌদ্ধ ধর্ম যে খুব সহজেই বাংলার নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ফেলবে একথা সহজেই অনুমেয়। নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ট পৌণ্ড্র জাতি বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন যেমন—'*পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ*' (১৯৭০), '*চম্পাহাটি আম্বেদকর দিশারী*' (১৯৮৮), '*সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতি*' (২০০১), '*ভারতীয় পুণ্ড্র সোসাইটি*' (২০০৬) ও '*পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ*' (২০০৮) প্রতিষ্ঠা করে পৌণ্ড্রদের 'মূলনিবাসী'/ 'আদিমবাসী'/ 'দলিত পরিচিতি'র সাথে সাথে 'বৌদ্ধ পরিচিতি' নির্মাণ করতে চাইছেন।[৩৭] এছাড়া মালদহের 'মাঝি পরগনা গাওতা' (২০০৩), 'মূলনিবাসী সমিতি' (২০০৬) ও 'গৌতম বুদ্ধ গাইডেন্স একাডেমি' (২০১১) প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্র, জেলিয়া কৈবর্ত্য, রাজবংশী ও আদিবাসীদের মধ্যে বুদ্ধ মাহাত্ম প্রচার করে চলেছেন।[৩৮] এখানে আমরা বৌদ্ধ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত এরকম দুটি সংগঠনের কথা আলোচনা করছি।

সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতি: এটি প্রতিষ্ঠা করেন ধূর্জটি নস্কর ২০০১ সালে ২৬ নভেম্বর (আম্বেদকর নগর, ডাকঘর: নয়াবাদ-রাজপুর, ভায়া: মথুরাপুর আর. এস., থানা: মথুরাপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। সমিতির নিবন্ধীকৃত সংখ্যা – এস/আই.এল/৬৫৮৪ (২০০১-২০০২)। সমিতির মূল কথা-'পড়ুন লিখুন বুঝুন সংগঠন করুন' (Read Write Realize Organize)। প্রতিবছর এই সমিতি ২৬শে জানুয়ারী 'জাতীয় দিবস উদযাপন' করে। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'জয় ভীম, জয় ভারত' জয়ধ্বনির মাধ্যমে। বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতি নিয়ে প্রভাত ফেরি করা হয় সকাল সাতটায়। একই সাথে এখানে পৌণ্ড্র মনীষী রাইচরণ সরদার, বেণীমাধব হালদার, মহেন্দ্রনাথ করণ, মহেন্দ্রনারায়ণ রায় নস্কর, পতিরাম রায়, ড. ভূষণচন্দ্র নস্কর, ব্রহ্মচারী ভোলানাথ, অক্ষয় কুমার কয়াল, শক্তি কুমার সরকার, চুনীলাল মণ্ডল, নরোত্তম হালদার, আচার্য শৈলেন্দ্রনাথ

হালদার, ড. কালীপদ মণ্ডল, রেণুপদ মণ্ডল, ড. সত্যেন্দ্রনাথ নস্কর, ড. জ্ঞানরঞ্জন হালদার প্রমুখের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এছাড়া, মহামতী বুদ্ধ, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, বীরসা মুণ্ডা, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিনয় মজুমদার, মান্যবর কাঁশীরাম প্রমুখের প্রতিকৃতিতেও মাল্যদান করা হয়।[৩৯]

বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের মহান জীবনাদর্শের অনুসারী ও প্রদর্শিত পথের পথিক হয়ে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের তপশিলি-অনগ্রসর দলিত জাতিসমূহের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের বৌদ্ধিক ঐক্য স্থাপনই হল এই সমিতির মূল লক্ষ্য।[৪০]

সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতির মূল কর্মসূচীগুলি হল-১. প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের পবিত্র জন্মদিনকে সমিতি জাতীয় স্তরে 'আম্বেদকর দিবস' বলে ঘোষণা ও পালনের আহ্বান জানায়; ২.একইসাথে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল 'আম্বেদকর পক্ষ' ও বুদ্ধপূর্ণিমা দিবস থেকে পক্ষকালব্যাপী 'বুদ্ধপক্ষ' পালন করার কথা সমিতি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে; ৩. অনগ্রসর সুন্দরবন অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিকযুগের উচ্চশিক্ষার জন্য 'সুন্দরবন আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার কথাও সমিতি ঘোষণা করে।[৪১]

সমিতি ২০০৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৯৩ জন গুণীজনকে সংবর্ধিত করেছেন। যে বিষয়গুলিতে গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় সেগুলি হল—মহামতি বুদ্ধ ও বৌদ্ধভারত ভাবনা পুরষ্কার, বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর জাতীয় চেতনা পুরষ্কার, মহাত্মা রাইচরণ সরদার স্মৃতি পুরষ্কার, চিন্তানায়ক শক্তিকুমার সরকার স্মৃতি পুরষ্কার, স্বামী বুদ্ধানন্দ স্মৃতি পুরষ্কার, ড. গুণধর বর্মণ স্মৃতি পুরষ্কার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ স্মৃতি পুরষ্কার, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি পুরষ্কার, স্বজনসেবী ড.ভূষণচন্দ্র নস্কর স্মৃতি পুরষ্কার, কবি গৌরহরি বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি পুরষ্কার, ড. সুশীল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরষ্কার, সমাজসেবী অমূল্যচরণ মণ্ডল স্মৃতি পুরষ্কার, জননেত্রী শান্তিলতা মণ্ডল স্মৃতি পুরষ্কার ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্মের মত ও পথকে অনুসরণ করে সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতি স্বজাতি উন্নয়ন করে চলেছেন।

পৌণ্ড্র মহাসংঘ: স্বাধীনতা পরবর্তী পৌণ্ড্র আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে 'পৌণ্ড্র মহাসংঘ' নামক সংগঠনটি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৩ ই ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে। সঙ্ঘের নিবন্ধীকৃত সংখ্যা এস/ ১এল/ ৬৩১২৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র সরদার (মহাস্থবির); শ্রীস্নেহাংশুশেখর মণ্ডল (সভাস্থবির); শ্রীমেঘনাথ হালদার (কর্মস্থবির); শ্রীবাসুদেব হালদার (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীদিলীপ গায়েন, শ্রীইন্দ্রকুমার হালদার,

শ্রীশেখররঞ্জন মিস্ত্রী, শ্রীসুজয়কুমার সর্দার, শ্রীভূপাল সরদার, শ্রীগোপীরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র নস্কর, শ্রী শৈলেন মণ্ডল, শ্রীমন্ত হালদার, শ্রীদিবাকর হালদার, শ্রীসুভাষ গায়েন, শ্রীগোবর্ধন দাস (মেদিনীপুর) প্রমখরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৪২]

এই সংগঠনটি বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করে তার নীতিকল্প্য বা সংবিধান বা গঠনতন্ত্র রচনা করেছে। সংবিধান রচনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন শ্রীসুজয় কুমার সরদার। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে বৌদ্ধ আঙ্গিক অনুযায়ী মহাসংঘের প্রধানকে বলা হচ্ছে 'মহাস্থবির' এবং সভা পরিচালককে বলা হচ্ছে 'সভাস্থবির' এবং কার্যপরিচালককে বলা হচ্ছে 'কর্মস্থবির'। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য পদও। মহাসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দের দ্বারা 'নীতিকল্প্য' নির্ধারণ করা হবে। মহাসঙ্ঘের তিন ধরণের সদস্যপদ প্রযোজ্য: আজীবন সদস্য (একহাজার টাকা), ত্রিবার্ষিক সদস্য (একশ টাকা) এবং সাধারণ বার্ষিক সদস্য (কুড়ি টাকা)।[৪৩]

যেকোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও দেশের মতো পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক-চিহ্ন রয়েছে। এই চিহ্নের দ্বারা ঐ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বা দেশের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্যে ইঙ্গিত করা হয়। যেমন- ভারতের জাতীয় প্রতীক 'অশোক স্তম্ভ'। এই স্তম্ভের দ্বারা সম্রাট অশোকের ধর্মনীতি (বৌদ্ধ), অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং আরো কিছু বিষয় বোঝানো হয়েছে। তেজ-বীর্য-শৌর্য পরিচায়ক এই স্তম্ভের দ্বারা ভারতের অতীত গৌরবগাঁথা তুলে ধরা হয়েছে। তেমনি প্রতিটি সংঘ বা সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানেরও প্রতীক থাকে যার দ্বারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের আদর্শ-নীতি উপস্থাপন করা হয়।[৪৪]

পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের প্রতীক-চিহ্ন রূপে: ১. সাদা রঙ শান্তি ও কর্মচঞ্চলতার প্রতীক এবং সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের প্রতীক। ২. নীল রঙের ভিত্ বা জমি আত্ম সচেতনতার প্রতীক, কেননা নিজেকে সচেতন না করে কেউও বাঁচতে পারে না। ৩. 'তির' চিহ্ন হল গতির প্রতীক। সংঘ বা সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতি মানুষ আস্থাশীল। মানুষ একাকী জীবন ধারণ করতে পারে না। তাই সঙ্ঘের প্রতি মানুষের থাকে তীব্র আকর্ষণ, সঙ্ঘের বাইরের মানুষেরা তীব্র গতিতে সঙ্ঘাভিমুখী হতে চায়---এটাই 'তির' চিহ্নের মর্মার্থ। ৪. লালবর্ণের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবকে বোঝানো হয়েছে। লাল বর্ণের তিরের ফলা হল বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশক।

মহাসঙ্ঘের ধম্মচক্রটি একুশটি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি গোলাকৃতি চক্র। এটা বৌদ্ধ সংস্কৃতি তথা ধম্মজাতেরই প্রতীক। মহাসঙ্ঘের তাত্ত্বিকরা মহাসঙ্ঘে 'ধম্মচক্র' ব্যবহারের

ক্ষেত্রে একটু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁদের মতে, বর্তমান বঙ্গপ্রদেশের প্রাচীনতম নাম পুণ্ড্রবর্ধন। খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্কের রাজত্বকাল (৫৯০খ্রিঃ-৬২৫খ্রিঃ) থেকে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম হয় গৌড়রাজ্য। এরপর পাল ও সেনযুগেও (৭৫০-১২০০ খ্রিঃ) গৌড় নাম বহাল ছিল। সেন পরবর্তী মুসলিম আমলে গৌড় হয়ে যায় বঙ্গ বা 'বঙ্গপ্রদেশ'।[৪৫]

ইতিহাসের এই ধারায় দেখা যায়, পালযুগ পর্যন্ত (১০৫০খ্রিঃ) পুণ্ড্র গৌড়ের মূলনিবাসী মানুষেরা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তখনও আর্যাবর্ত (উত্তর ভারত) থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মের (হিন্দু) আগমন এই পুণ্ড্র-গৌড়ে হয়নি। স্বভাবতই এ অঞ্চলের পৌণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ ধর্মীয়ভাবে স্বাধীন ছিল। তারা শূদ্র বা নিচু বর্ণ ছিল না। নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'ব্রাহ্মণ' নামক কোনো উঁচুবর্ণ ছিল না।

ব্রাহ্মণ বা হিন্দুধর্মের আধিপত্য ঘটেছে পাল পরবর্তী সেন আমল থেকে (১০৫০ খ্রীঃ)। সেন রাজা ও তাঁদের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দৌরাত্ম্যে পুণ্ড্র-গৌড়ের মানুষেরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম (হিন্দু) নিতে থাকেন। বৌদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ধর্মান্তরিত এই মানুষেরা বুদ্ধের নামও উচ্চারণ করতে পারতেন না। সেন রাজারা বহু বৌদ্ধ মঠ ও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু মানুষের মন থেকে বৌদ্ধধর্মের নীতি একেবারে ধ্বংস করা যায় নি। তাই বৌদ্ধরা সেন রাজা ও তাঁদের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভয়ে 'ধম্মঠাকুর' নামে বুদ্ধের স্মরণ করে থাকেন। বুদ্ধ জন্মজয়ন্তীতেই তাঁরা 'ধম্মের জাত' অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে ব-কলমে বুদ্ধ-জয়ন্তীই পালন করতেন। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ঠেকানোর জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধরা কালী, শীতলা, শনি, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর-ও সৃষ্টি করলেন। শিব বা শৈবধর্ম তো পূর্ব থেকেই ছিল। এসবই ব্রাহ্মণ্য বর্জিত ধর্মানুষ্ঠান। বর্তমানে এই সব দেব-দেবীকে 'লৌকিক দেব-দেবী' বলা হয়।

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ধীরে ধীরে লৌকিক দেব-দেবীর পুজো আরম্ভ করল। তখন মূলনিবাসী বৌদ্ধরা ধূর্ত ব্রাহ্মণদের শিকার হলেন। তবুও কিছু সচেতন বৌদ্ধ মানুষ বুদ্ধ-জয়ন্তী ও ধম্মের জাত অনুষ্ঠান করতেন যা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণবর্জিত। আজও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্ররা কোথাও কোথাও বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে ধম্মের জাত অনুষ্ঠান করে থাকেন। কোনো মূর্তি নেই, ব্রাহ্মণের মন্ত্রতন্ত্রও নেই। ঐতিহাসিকদের অভিমত পুণ্ড্র-গৌড় বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসী পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্ররাই সেন আমল থেকেই এই ধম্মজাতের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। বর্তমান পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ

পৌণ্ড্রসমাজের সুবিপুল জনগোষ্ঠীকে ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতন করার লক্ষ্যে এই ধম্মের জাত অনুষ্ঠানকেই স্মরণ করতে চাইছে।[৪৬]

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থকে একথা স্পষ্ট যে, দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধরা মূলত উত্তরবঙ্গকেই তাঁদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন একস্থানে বসবাসের ফলে তাঁদের সাথে বাঙালি সংস্কৃতির একটা মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ বৌদ্ধরা ছিলেন থেরবাদী। এখানে বিভিন্ন সংগঠন, বিহার প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখেছিলেন। অপেক্ষাকৃতভাবে কলকাতা সংলগ্ন বৌদ্ধরা অনেকাংশে সনাতন সংস্কৃতির সাথে মিশে যাচ্ছেন। আবার এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মানুষরা বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরে নতুন করে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণ করতে শুরু করেছেন।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. ১৯৪১ সালের জনগণনা।

২. *তদেব*।

৩. https://en.m.wikipedia.org, access date: 14.04.2019.

৪. বিমলানন্দ শাসমল: *ভারত কি করে ভাগ হলো,* (কলকাতা, তিন সঙ্গী, ১৯৮১), পৃ.১৬।

৫. *তদেব*।

৬. জিজেন্দ্র লাল বড়ুয়া: *বৌদ্ধ সংস্কৃতি বনাম বাঙালি সংস্কৃতি,* (ঢাকা, অন্যনবাজার, ২০১৪), পৃ. ৬১।

৭. *Annual Report of the Department of Rehabilitation, 1965-66*, (New Delhi, Department of Rehabilitation, Government of India, 1967).

৮. http:// bn. Banglapeddia.org/index.php?ti, access date: 15.04.2019.

৯. ১৯৯১ সালের জনগণনা, বাংলাদেশ।

১০. https://joshuaproject.net/people_groups/11293/IN, access date, 15.04.2019.

১১. লতিকা বড়ুয়া: *সাক্ষাৎকার*। গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন ২৮.০৪.২০১৯।

১২. মনমোহন বড়ুয়া: *সাক্ষাৎকার*। গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন ১৩.০১.২০১৯।

১৩. স্বপন কুমার বড়ুয়া: *সাক্ষাৎকার*। গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন ১২.০১.২০১৯।

১৪. গোলাম মুরশিদ: *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* (ঢাকা, অবসর, ২০০৬)।

১৫. জাকিরুল হক: *বাংলাদেশ এবং বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* (ঢাকা, পুঁথিনিলয়, ২০১৬), পৃ. ১০১।

১৬. *তদেব*।

১৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: *বৌদ্ধগান ও দোহা,* (কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ১৩২৩)।

১৮. আহমদ শরীফ: *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা, চলন্তিকা, ২০০৫), পৃ. ২২।

১৯. নীহার রঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০১)।

২০. বনলতা বড়ুয়া: *সাক্ষাৎকার।* গবেষক নিজে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ২৮.০৪.২০১৯।

২১. টালিগঞ্জ মুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির আয়োজিত (২৭.০৪.২০১৯) ধর্মসভার অনুষ্ঠান থেকে
আহৃত তথ্য।

২২. মীরা বড়ুয়া: *সাক্ষাৎকার,* গবেষক নিজে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ২৮.০৪.২০১৯।

২৩. বরুণ বিকাশ বড়ুয়া: উত্তরবঙ্গে থেরবাদী বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান, ভিক্ষু, সত্যপাল (সম্পা.): *ধম্মচক্কং,* (নিউও দিল্লী, বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, ২০১২), পৃ. ১৪২।

২৪. *তদেব*।

২৫. *তদেব*।

২৬. *তদেব*।

২৭. *তদেব*।

২৮. *তদেব*।

২৯. *তদেব*।

৩০. *তদেব,* পৃ.১৪৩।

৩১. *তদেব*।

৩২. *তদেব*।

৩৩. *তদেব*।

৩৪. *তদেব*।

৩৫. মহাবোধি সোসাইটি (কলকাতা) থেকে গবেষক এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

৩৬. টালিগঞ্জ মুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির আয়োজিত (২৭.০৪.২০১৯) ধর্মসভার অনুষ্ঠান থেকে
আহৃত তথ্য।

৩৭. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌণ্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১),* (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ২০১৮), পৃ.পৃ. ২২৪-২২৫।

৩৮. উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলা পরিদর্শন করে গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

৩৯. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৮, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- দিলীপ গায়েন পৌণ্ড্র সমাজ পরিচয়, (কলকাতা, গীতাপ্রেস, ২০১০), পৃ. ৯।

৪০. *তদেব*।

৪১ *তদেব*, পৃ.২৫৯।

৪২ *তদেব*, পৃ.২৬৪।

৪৩. *তদেব।*

৪৪. *তদেব।*

৪৫. *তদেব*, ২৬৫।

৪৬. *তদেব*, পৃ. ২৬৬।

উপসংহার

'বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়' সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গৌতম বা সিদ্ধার্থ প্রচণ্ড অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বহুমার্গ ঘুরে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন। ভারতের এই মহান কৃতিসন্তান, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গৌতম বুদ্ধ আজও সমগ্র বিশ্বে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে কম হলেও বুদ্ধের জ্ঞানাদর্শ তথা দর্শনের মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। আধুনিক ভারত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বুদ্ধের দেখানো পথেই অগ্রসর হচ্ছে তার সাংবিধানিক ব্যবস্থার দিয়ে সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গলার্থে।

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্ম রূপে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই বঙ্গের মানুষের ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। তাদের জীবন চর্চায় এনে দিয়েছিল স্থায়ী পরিবর্তন। জিবন যাত্রার মানকে করে ছিল উৎকৃষ্ট। একসময় বঙ্গভূমিকে 'ম্লেচ্ছদের দেশ' হিসেবে সঙ্গায়িত করা হত। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অবজ্ঞাভরে উচ্চারিত এই বঙ্গভূমিকে বৌদ্ধধর্ম অতিসম্মানের সাথে বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত করেছিল। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানাচার্য অতীশ দীপঙ্কর এই বঙ্গভূমিরই সন্তান। সোমপুরি, নালন্দা, জগদ্দলের মত বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এই বঙ্গভূমিতে। এর নেপথ্য ছিল বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের সুগভীর প্রভাব।

গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বুদ্ধ জীবিত থাকাকালীনই বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক অগ্রগতির প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গৌড়রাজ শশাঙ্ক(৬০৬খ্রি.)। বৌদ্ধ বিদ্বেষী শশাঙ্কের আমালে এই ধর্ম তার মাহাত্ম হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা গোপালের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম তার হৃতগৌরব আবার ফিরে পায়। পাল আমলেও বৌদ্ধ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই সময় বৌদ্ধবিহারগুলি শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলার নিজস্ব আচার সংস্কৃতির সাথে বৌদ্ধধর্মের একটা সংহতি গড়ে উঠেছিল। যার ফলস্বরূপ তান্ত্রিকতা বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ

করে এবং বৌদ্ধধর্মের বিভাজন রেখায় নতুন শাখা স্বরূপ মন্ত্রযান ও বজ্রযান এই দুটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।মূলত পাল আমলের শেষভাগ থেকে এই বিষয়গুলি লক্ষ করা যায়। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাব এই প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম একপ্রকার লুপ্তপ্রায় ধর্মে পরিণত হয়।

তবে বাংলার পূর্বপ্রান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বৌদ্ধ ধর্ম তার উজ্জ্বল উপস্থিতির ধারা বজায় রেখেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে যখন লেখ্যাগার তৈরিতে ব্যস্ত তখন পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তাদের বাসস্থানের চিহ্ন জনমানসে প্রতীয়মান হয়ে পড়ে। এর পর রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই আন্দোলনে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত বৌদ্ধদের অংশগ্রহণের কথা আমরা গবেষণার মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হয়েছি। এরপর দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে বসবাসরত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েন। তারা বাংলাভাগের বিষয়টিকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তারা বাধ্য হয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে।

গবেষণায় আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসিত পশ্চিমবঙ্গে আগত বাঙালি বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তারা মূলত উত্তরবঙ্গকেই তাদের প্রধান আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অনেকে স্বচ্ছায়, কর্মসংস্থানের তাগিদে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের বসতবাড়ি গড়ে তুলেছিলেন। আজও উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ পাড়ার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বৌদ্ধদের মধ্যে ‘বড়ুয়া’ ও ‘সিংহ’ পদবীধারীদের সংখ্যা বেশি পরিমানে দেখা যায়। তারা আজও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখে চলেছেন নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও।

আলোচ্য গবেষণায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। সেটি হল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মানুষরা বুদ্ধের আদর্শকে

সামনে রেখে ‘নতুন পরিচিতি নির্মাণ’র ধারা গড়ে তুলতে চাইছেন বা চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠী বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় স্বরূপ ‘বৌদ্ধ ধর্ম’কে পুনরায় স্থাপন করতে চাইছেন। মূলত ১৯৭০ সাল পরবর্তী বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তারা জনমানসে এবং সরকারের কাছে তাদের দাবি পেশ করে চলেছেন। এই প্রবণতা ক্রমশ অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিভিন্ন সংগঠনের কথা আমাদের সন্দর্ভে উল্লেখ করেছি। নিম্নবর্ণীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত এই সংগঠনগুলির আত্মপ্রত্যয় কিন্তু একটা নতুন দিকের ইঙ্গিত করে।

সংযোজনী

চিত্র ১: বৌদ্ধ ধর্মসভাতে আমন্ত্রিত শিখ ধর্মগুরু সুখরঞ্জন সিংহ আলুআলিয়া

চিত্র ২: বৌদ্ধ ধর্মসভাতে আমন্ত্রিত জৈন ধর্মগুরু মুনি মহারাজ

৩ (ক)

৩ (খ)

৩ (গ)

চিত্র ৩ (ক), 2(খ), 2(গ): উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠন

৪ (ক)

৪(খ)

৪(গ)

চিত্র ৪ (ক), ৪(খ), ৪(গ): কালচক্র বুদ্ধ মন্দিরে সংগৃহীত প্রাচীন পালি পুথি

চিত্র ৫: সাক্ষাৎকার: গবেষক ও এস কে চাকমা ডান দিক থেকে

চিত্র ৬: সাক্ষাৎকার: মীরা বড়ুয়া

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি:

Banerjee, Himadri (et.al): *Calcutta Mosaic*: Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta, Anthem South Asian Studies, Anthem Press, 2009.

Bapat, P.V.(ed): *2500 Years of Buddhism*, Seventh Reprint, Government of India, Publication Division, 2009, পৃ.পৃ. ৩১৯-৩৩০।

Barman, Rup Kumar**:** *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal,* New Delhi, Abhijeet Publications, 2012.

Beal, S.: *Buddhist records of the Western World*, London, Tkunner & Co., 1844.

Bhattacharyya, P.: *Shashanka*, Banglapedia, P. S. Islam. Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2008.

Brown, Judith: *Gandhis Rise to Power 1915-1922,* CUP, 1974.

Burnuf, Eugene: *Introductional Historic du Bouddhisme Indien*, Paris, Maisonneuve, Et Libraires Editures, 1876.

Chakrabarti, Dilip K.: *Ancient Bangladesh (A Study of the Archaeological Sources with an Update on Bangladesh Archaeology, 1990-2000)*, Dhaka, The University Press Limited, 2001.

Chatterjee, Joya: *The Spoils of Partition: Bangala and India,* Cambridge University Press, 2009.

Chattopadhyaya, Alaka (ed): *Essays on Indology: Birth Centenary Tribute to Mahapandita Rahule Sankrityayana,* Calcutta, Manisha Granthalaya (p) Ltd. 1994.

Chakma, N. K.: *Buddhism,* Banglapedia. P. S. Islam, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2008.

Chowdhury, A.: *History: Ancient Period*, Banglapedia. P. S Islam, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2008.

Dasgupta, N.: Settlements in ancient Bengal: some Observations, *Journal of Asiatic Society of Bengladesh (Humanities) Golden Jubilee Volume (1956 - 2005)*, 2005.

Dutt, S.: *Buddhist Monks and Monasteries of India: Their history and their contribution to Indian culture*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2008.

Heras, R. H.: *The Royal Patrons of the University of Nalanda, Journal of the Bihar and Orissa Research Society Vol. XIV, (PART I.),* পৃ.পৃ. ১-২৩।

Hossain, M. M. and T. A. Dewan: *Mainamati-Lalmai*, Dhaka, Department of Archaeology, 2004.

Islam, S.: Recently discovered coins and the history of the Khadgas, *Journal of Asiatic Society of Bengladesh (Humanities) 53*, 2008.

Jayaswal, K. P.: *An Imperial History of India in a Sanskrit text: With a Special Comentry on later Gupta period*, Lahore, Motilal Banarsi Dass, 1934.

Kanitkar, Satish: *Refugee Problems in South Asia*, Delhi, Rajat Publications, 2000.

Khan, M. A.: Banglar Itihash o shangskritite Deva Rajbongsher Obodan, *Pratnatattva 9(June 2003): 11-14*, 2003.

Khan, M. A.: *Rata bongsher kala proshango: Ponditder dharona porjalochana Pratnatattva* ***10****(June 2004):* 13-18, 2004.

Legge, J.: *A record of Buddhistic kingdoms*, Oxford, Oxford University Press, 1886.

Mondal, Monika: *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal*, Delhi, Monohar, 2011.

Mookerji, R.: *The Gupta Empire*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 2007.

Omvedt, Gail: *Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste*, Delhi, Sage Publications, 2003.

Prakash, Kanti B.: *The Uprooted: A Sociological Study on the Refugee of West Bengal*, Calcutta, Editions Indian, 1971.

Ramachandran, T. N.: *Tamralipti, Artibus Asiae* ***10****(3*), 1951, পৃ.পৃ. ২২৬-২৩৯।

Ramaswami, N. S.: *Indian Monuments,* Delhi, Abhinav Publications, 1971.

Rashid, M. H.: *Rata Dynasty,* Banglapedia, P. S. Islam, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2008.

Ray, K.: *Khadga Dynasty,* Banglapedia, P. S. Islam, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2008.

Reza, M. H.: *Early Buddhist architecture of Bengal: Morphological study on the vihāra of c. 3rd to 8th centuries', Architecture. Nottingham*, U. K, Nottingham Trent University, **PhD,** 2016.

Smith, Vincent A.: *Asoka: The Buddhist Emperor of Indi*a, Delhi, Low Price Publications, 2002.

বাংলা:

আম্বেদকর, বি. আর (অনুবাদ, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়): *বুদ্ধ ও তার ধম্ম,* নদীয়া, বোধিগৃহ, ২০১১।

ইসলাম, শহিদুল: *দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

গায়েন, দিলীপ: *সদ্ধম্ম বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ঐতিহ্য তথা সনাতন ধম্ম,* বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশপরগানা, বৌদ্ধদর্শন পাঠচক্র, ২০১২

ঘোষ, বারিদবরন(সম্পাঃ): *বৌদ্ধযুগের ভারত,* কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১৬।

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র: *চকমা জাতি জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত,* ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯০৯।

চক্রবর্তী, প্রফুল্ল: *প্রান্তিক মানব,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, কিশোরমোহন: *প্রজ্ঞাপারমিতা- সূত্রম,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০১২।

চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ: *দেশ বিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী,* কলকাতা,আনন্দ, ১৯৯৩।

চ্যাটার্জী, জয়া: *দেশভাগের অর্জন (বাংলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৭৬)*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদ্রাস, ২০২৭।

চৌধুরী, সাধনকমল: *ইতিহাসের আলোয় গৌতমবুদ্ধ,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ১৯৯৭।

----------: *প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০০০।

----------:*চুললবগগ,* কলকাতা,করুনা প্রকাশনী, ১৪১৮।

চৌধুরী, সাধনকমল (সম্পাঃ): *বুদ্ধচরিত,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০১৯।

চৌধুরী, সাধনকমল: *ভারতের নির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও অজ্ঞাত ইতিহাস,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০১৯।

চৌধুরি, ননীগোপাল: *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪।

ঝা, দেবচন্দ্র: *মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ও ভারত ভাগ,* কলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, ২০০৩।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ: বৌদ্ধ ধর্ম, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৯।

ত্রিপাঠী, অমলেশ: ইতালীর র‍্যানেসাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

দস্তিদার, শিপ্রা রক্ষিত: *বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও অন্যান্য,* ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস: বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০০৮।

বড়ুয়া, বরুণ বিকাশ: উত্তরবঙ্গে থেরবাদী বৌদ্ধদের ধর্মীয় অবস্থান, ভিক্ষু, সত্যপাল (সম্পা.): *ধম্মচক্কং,* নিউ দিল্লী, বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, ২০১২, পৃ.পৃ. ১৪২-১৪৩।

বড়ুয়া, প্রণব কুমার: *মুক্তি যুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১।

বড়ুয়া, দিলিপ কুমার ও ডঃ আনিসুজ্জামান মোঃ : *বাংলাদেশে বৌদ্ধদর্শন,* ঢাকা,জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮

বসু, জ্যোতির্ময়: *সাতচল্লিশের দেশভাগ,* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র: *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৪।

বিশ্বাস, স্বপন কুমার : *বৌদ্ধ ধর্ম সিন্ধু- হরপ্পা কালের ভারতীয় ধর্ম্ম,* দলিত বহুজন ইনটেলেকচুয়াল ফোরাম অফ ইন্ডিয়া, দিলশান গার্ডেন, ২০০৫।

বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন: *বুদ্ধদেব-চরিত,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০১১।

মণ্ডল, সোমদত্তা ও হাজরা, শুক্লা: *বঙ্গবিভাগ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন,* কলকাতা দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০২।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।

মিত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র: *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ১৯৯৮।

মুরশিদ, গোলাম: *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা, অবসর, ২০০৬।

রফিক, আহমেদ: *দেশ বিভাগ ফিরে দেখা,* ঢাকা,অনিন্দ প্রকাশ, ২০১৪।

রহমান, এম. মতিয়ার: *বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব ও যুক্তি,* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩।

রায় অন্নদাশঙ্কর: বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা, প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯।

রায়, নীহাররঞ্জন: বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০১।

----------:ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ: *বৌদ্ধধর্ম,* ঢাকা,নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১১০০।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পাঃ) : *বৌদ্ধগান ও দোহা,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ১৩২৩।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পাঃ): *বিষয় বৌদ্ধধর্ম,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০০২।

সঙ্কট, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৫।

সরকার, সুমিত: *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ২০০৪।

সরদার, মনোরঞ্জন: *বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম,* কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১৭।

সরকার, প্রভারঞ্জন: *বাংলা ও বাঙালী,* কলকাতা, আনন্দমার্গ প্রচার সংঘ, ১৯৮৮।

সরকার, যতীন: *পাকিস্থানের জন্মমৃত্যু-দর্শন,* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

সিংহ, কঙ্কর: *১৯৪৭ এর বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল,* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।

সেন, কৃষ্ণবিহারি: *অশোক চরিত,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০০৪।

সেন, প্রবোধচন্দ্র, *ধর্মবিজয়ী অশোক,* কলকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৯৭।

হাবিব, ইরফান ও ঝাঁ, বিবেকানন্দ(সম্পা): *মৌর্য যুগের ভারত,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬।

হালদার, মণিকুন্তলা: বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৬।

বৈদুতিন গ্রন্থপঞ্জি:

https://en.m.wikipedia.org, access date: 14.04.2019.

https://joshuaproject.net/people_groups/11293/IN, access date, 15.04.2019.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Bangladesh